ম্যানগ্রোভ ২০২৬

৩য় সংখ্যা

মোংলা সরকারি কলেজ
স্থাপিত : ১৯৮১

মোংলা সরকারি কলেজ

মোংলা, বাগেরহাট

ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)
DHORITRI ROKHHAY AMRA (DHORA)

সুন্দরবন রক্ষায় আমরা, ধরা

কলের চাপে ভরাট খাল
জোয়ার ভাটায় বেসামাল

জাহাজ আসে দমে দমে
আঘাত করে জলের যমে

ভাঙছে পাড় যায়রে ভিটা
পশুরবনের ক্রান্তিকাল

কলেজবার্ষিকী

ম্যানগ্রোভ ২০২৬

তৃতীয় সংখ্যা

মোংলা সরকারি কলেজ
স্থাপিত : ১৯৮১

মোংলা সরকারি কলেজ
মোংলা, বাগেরহাট

কলেজবার্ষিকী

ম্যানগ্রোভ ২০২৬

তৃতীয় সংখ্যা

১৮ই মে, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

সম্পাদনা পরিষদ

শ্যামা প্রসাদ সেন, প্রভাষক, সমাজকর্ম
প্রদীপ অধিকারী, প্রভাষক, দর্শন
মনোজকান্তি বিশ্বাস, প্রভাষক, বাংলা
এস এম মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক, ইংরেজি
সাহারা বেগম, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা

প্রকাশনা

মোংলা সরকারি কলেজ
মোংলা, বাগেরহাট

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

প্রফেসর কে. এম. রব্বানী

আলোকচিত্র গ্রহণ

এস এম মাহবুবুর রহমান

অক্ষরবিন্যাস ও অলংকরণ

মোঃ হাফিজুর রহমান

মুদ্রণ

রবি প্রিন্টিং প্রেস

শান্তিধাম মোড়, খুলনা। ফোন : ০১৭১১-২৯৫০৮৭

e-mail : rabipressbd@gmail.com

প্রতিমন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছাবাণী

মোংলা সরকারি কলেজের কলেজবার্ষিকী **ম্যানগ্রোভ**-এর ৩য় সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষ্যে আমি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মোংলা সরকারি কলেজ আমার নির্বাচনী এলাকা বাগেরহাট-৩ (রামপাল-মোংলা)-এর মধ্যে অবস্থিত। এ অঞ্চলের প্রকৃতি, নদী-নালা এবং ম্যানগ্রোভ বন আমাদের জীবন-সংস্কৃতি ও পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি জেনেছি, **ম্যানগ্রোভ**-এ এই অঞ্চলের জলবায়ু, পরিবেশ, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপর অধিকাংশ লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই অঞ্চলের সন্তানদের হাতে **ম্যানগ্রোভ** নামের এমন একটি সৃজনশীল প্রকাশনা গড়ে ওঠা সত্যিই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি যেমন আমাদের পরিবেশগত ঐতিহ্যের প্রতিফলন, তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সচেতনতা গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে, যার অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল আমাদের এই উপকূলীয় এলাকা। তাই এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা, দায়িত্ববোধ এবং টেকসই চিন্তাধারা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। আমি আশাবাদী, **ম্যানগ্রোভ**-এর এই সংখ্যা সেই লক্ষ্য পূরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মোংলা সরকারি কলেজ এই অঞ্চলের শিক্ষার অগ্রযাত্রায় দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। মোংলা সরকারি কলেজ জ্ঞানচর্চা, নৈতিকতা ও সৃজনশীলতা বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।

ম্যানগ্রোভ-এর ৩য় সংখ্যার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

(শেখ ফরিদুল ইসলাম, এমপি)

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

শুভেচ্ছাবাণী

মোংলা সরকারি কলেজের কলেজবার্ষিকী **ম্যানগ্রোভ**-এর ৩য় সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এর পরিধি বিস্তৃত থাকে সৃজনশীলতা, চিন্তার স্বাধীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে। একটি কলেজবার্ষিকী সেই সৃজনশীল শিক্ষারই এক উজ্জ্বল প্রতিফলন। **ম্যানগ্রোভ** শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও সৃজনশীল চর্চার এক অনন্য মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে- যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতীকী নাম **ম্যানগ্রোভ** আমাদের সংগ্রাম, সহনশীলতা এবং অভিযোজন ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বার্ষিকীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চায় নিজেদের সম্পৃক্ত করছে, তেমনি তারা সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতাও অনুভব করতে শিখছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি আশা করি, এই প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ এবং ইতিবাচক মূল্যবোধ চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে এটি শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনীসত্ত্বার এক সুন্দর সমন্বয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ম্যানগ্রোভ-এর ৩য় সংখ্যার সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং মোংলা সরকারি কলেজের অগ্রযাত্রা আরও বেগবান হোক, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

(প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল)

মোংলা সরকারি কলেজ
স্থাপিত : ১৯৮১

অধ্যক্ষ
মোংলা সরকারি কলেজ
মোংলা, বাগেরহাট

শুভেচ্ছাবাণী

মোংলা সরকারি কলেজের বার্ষিকী **ম্যানগ্রোভ**-এর ৩য় সংখ্যা প্রকাশের এই আনন্দময় প্রয়াসে আমি গভীর সন্তোষ প্রকাশ করছি এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সহযোগীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, মূল্যবোধ এবং জ্ঞানচর্চার প্রতি অঙ্গীকারে। **ম্যানগ্রোভ** সেই শক্তিরই এক সুন্দর বহিঃপ্রকাশ। এই বার্ষিকীর পাতায় শিক্ষার্থীদের চিন্তা, অনুভূতি, গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাহিত্যচর্চার প্রতিফলন আমাদেরকে নতুন করে আশাবাদী করে তোলে।

মোংলা সরকারি কলেজ অন্যতম "ক্লাইমেট ভিক্টিম" অঞ্চলে অবস্থিত। এ কারণেই আমরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর অভিঘাতকেই লেখায় প্রাধান্য দিয়েছি। কলেজ বার্ষিকীর নামকরণেও তার প্রতিফলন রয়েছে।

মোংলা সরকারি কলেজ কেবল পাঠদানেই সীমাবদ্ধ নয়; আমরা শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে বিশ্বাসী। পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এই প্রেক্ষাপটে কলেজ বার্ষিকী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা নিজেদের মেধা ও মননের বিকাশ ঘটাতে পারে।

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই **ম্যানগ্রোভ** প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সম্পাদকমণ্ডলী, শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের, যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠায় এই প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। তাদের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে–এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করি।

'ম্যানগ্রোভ'-এর ৩য় সংখ্যার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং ভবিষ্যতে এই প্রকাশনা আরও সমৃদ্ধ হবে এই প্রত্যাশা করছি।

(প্রফেসর কে এম রব্বানী)

PASHUR RIVER
WATERKEEPER®
WATERKEEPERS®
BANGLADESH
SAVE THE PASHUR RIVER
SAVE THE SUNDARBANS
WATERKEEPER ALLIANCE
MEMBER

মোংলা সরকারি কলেজের "ম্যানগ্রোভ" প্রকাশনার সফলতা কামনা ক র।

জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিতে বাংলাদেশের উপকূল

এখনই প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ, ন্যায্য বাজেট ও টেকসই উন্নয়ন।

- "উপকূল উন্নয়ন বোর্ড" গঠন করে সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে
- বড় জলাধার নির্মাণ করে নিরাপদ পানির স্থায়ী সমাধান করতে হবে।
- টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদীখনন ও জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- জাতীয় বাজেটে উপকূলের জন্য আলাদা ও পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে
- প্রতিটি পরিবারকে নিরাপদ রাখতে "একটি বাড়ি, একটি সেল্টার" কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করতে হবে
- উপকূলীয় স্বাস্থ্যসেবা ও জরুরি সেবা শক্তিশালী করতে হবে
- সমুদ্রগামী জেলে ও উপকূলবাসীর জন্য জীবনবীমা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে
- সুন্দরবনসহ প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ সংরক্ষণ করতে হবে

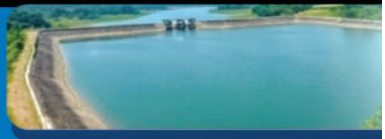

জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা উপকূলকে উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ চাই

দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষকে পিছনে ফেলে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। তাই দেশের উপকূলের সকল মানুষের টেকসই জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতে হবে।

LEDARS
Local Environment Development and Agricultural Research Society

কলেজের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং কলেজ ম্যাগাজিন **ম্যানগ্রোভ**-এর ২য় সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন উৎসব

উপকূলীয় জীবন-জীবিকা বিশেষ করে সুন্দরবনের প্রাণ-প্রকৃতি, ম্যানগ্রোভ ও নারীর অধিকার রক্ষার সংগ্রামে আমরা পাশে আছি।

ভূমির অধিকার, মৎস্যজীবী নারীর অধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন, নারী-কৃষক অধিকার বিষয়ে বাদাবন সংঘ কাজ করে।

badabonsangho.bd@gmail.com
Address: Rakhalgachi, C&B Bazar
Bagerhat Sadar, Bagerhat

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(A Women's Rights Organisation)

সম্পাদকীয়

শব্দেরও একটি নিজস্ব ভূগোল আছে। কোনো শব্দ নদীর মতো বয়ে যায়, কোনো শব্দ বৃক্ষের মতো শিকড় গেঁথে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো শব্দ আবার জোয়ারের মতো ফিরে ফিরে আসে মানুষের মনোজগতে। মোংলা সরকারি কলেজের বার্ষিকী **'ম্যানগ্রোভ'** সেই শব্দেরই এক সবুজ ভূখণ্ড; যেখানে স্মৃতি, স্বপ্ন, মনন, সৃজন এবং সময় একসঙ্গে আশ্রয় খুঁজে পায়।

আমাদের এই জনপদ নদী, বন, জোয়ার, কাদামাটি এবং মানুষের জীবনসংগ্রামের এক অপূর্ব পাঠশালা। এখানে প্রকৃতি শুধু দৃশ্য নয়, অভিজ্ঞতা; শুধু পরিবেশ নয়, অস্তিত্ব। সেই জীবনবোধ থেকেই **'ম্যানগ্রোভ'** নামের জন্ম। ম্যানগ্রোভ যেমন প্রতিকূলতার ভেতরেও শেকড় ছড়িয়ে টিকে থাকে, তেমনি জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও মানবিকতার শক্তিতে একজন শিক্ষার্থীও নিজের ভেতর গড়ে তোলে অভিযোজন-দক্ষতা, স্থিতি এবং সহনশীলতা। এই বার্ষিকী সেই অন্তর্গত বিকাশেরই একটি রোজনামচা।

একটি কলেজ ম্যাগাজিন কেবল লেখা সংকলনের নাম নয়। এটি একটি সময়ের প্রতিচ্ছবি, একটি প্রজন্মের কণ্ঠস্বর, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ। পাঠ্যবইয়ের বাইরে যে বিস্তৃত জগৎ– ভাবনা, প্রশ্ন, কল্পনা, দ্বিধা, প্রতিবাদ, স্বপ্ন এবং সৌন্দর্যের– সেই জগতের দরজা খুলে দেয় একটি বার্ষিকী। এখানে যেমন কবিতা আছে, তেমনি আছে যুক্তি; যেমন গল্প আছে, তেমনি আছে অনুসন্ধান; যেমন অনুভব আছে, তেমনি আছে ভবিষ্যৎ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা।

শিক্ষা কেবল তথ্য অর্জনের বিষয় নয়; শিক্ষা মানুষকে দেখতে শেখায়, শুনতে শেখায়, অনুভব করতে শেখায়। একটি তরুণ মন যখন প্রথম নিজের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে শেখে, তখনই তার প্রকৃত শিক্ষার সূচনা ঘটে। **'ম্যানগ্রোভ'** সেই প্রকাশের ক্ষেত্র–যেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু লেখে না, তারা নিজেদের আবিষ্কার করে; শুধু মত প্রকাশ করে না, তারা নিজেদের সময়কে চিনতে শেখে।

এই সংখ্যার প্রতিটি লেখা, প্রতিটি চিত্র, প্রতিটি বিন্যাসের পেছনে আছে বহু মানুষের শ্রম, আন্তরিকতা এবং নীরব একনিষ্ঠা। শিক্ষকবৃন্দের দিকনির্দেশনা, শিক্ষার্থীদের উদ্যম, লেখকদের সৃজনশীল অংশগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় **'ম্যানগ্রোভ'**-এর তৃতীয় সংখ্যা আজ পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। এই যাত্রা কেবল প্রকাশের নয়; এটি একসঙ্গে শেখার, গড়ে ওঠার এবং একটি বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল নির্মাণের যাত্রা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ভালো বার্ষিকী কেবল একবার পড়ার জন্য নয়; এটি ফিরে দেখার জন্য, মনে রাখার জন্য এবং ভবিষ্যতের কাছে রেখে যাওয়ার জন্য। আজ যে তরুণ এই পৃষ্ঠায় নিজের প্রথম কবিতা লিখছে, হয়তো আগামী দিনে সে-ই সমাজের ভাষা নির্মাণ করবে। আজ যে শিক্ষার্থী প্রশ্ন তুলছে, আগামীকাল সে-ই হয়তো উত্তর খোঁজার দায় নেবে। এই আস্থাই আমাদের সাহস জোগায়।

'ম্যানগ্রোভ'-এর ৩য় সংখ্যা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই সংখ্যার প্রতিটি রচনা পাঠকের চিন্তায় নতুন তরঙ্গ তুলবে, অনুভবে নতুন আলো জ্বালাবে এবং মননে নতুন জিজ্ঞাসার উদ্রেক করবে–এই প্রত্যাশা রইল।

শব্দের এই সবুজ অরণ্যে আপনাকে স্বাগতম।

সম্পাদনা পরিষদ
"ম্যানগ্রোভ"

সূচিপত্র

- একনজরে মোংলা সরকারি কলেজ ১১
- মাদকাসক্তি-একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা | শ্যামা প্রসাদ সেন ১৩
- জেন-জি প্রজন্ম বনাম আমরা | এস,এম, মাহবুবুর রহমান ১৭
- ইসলামে নারী মর্যাদা ও অধিকার | আ ই শ ম বাকী বিল্লাহ ২২
- যৌতুক | রঞ্জিতা মন্ডল ২৮
- সংযম | প্রমীলা রায় ৩০
- কাছারিঘর : গ্রামীণ আত্মার ইতিহাস | পলাশ চক্রবর্তী ৩২
- আত্মসমর্পণ | মমতাজ খানম ৩৪
- মানবসভ্যতার বিকাশে ভাষার ভূমিকা | কে এম রব্বানী ৩৯
- মেঘদূত | ড. অপর্ণা অধিকারী ৫১
- কবি জয়দেব ও তাঁর গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দম্' | ড. অসিত কুমার বসু ৫৫
- নজরুল-সাহিত্যে দেশপ্রেমের স্বরূপ অন্বেষণ | প্রদীপ অধিকারী ৬০
- আবুবকর সিদ্দিকের কথা সাহিত্যে ব্রাত্যজন ও ব্রাত্যভাষা | মনোজকান্তি বিশ্বাস ৬৬
- একুশের লড়াই : সংস্কৃতির মুক্তি | রূপা দাস ৭৭
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন | মোঃ কামালউদ্দিন ৭৯
- ইরান কেন পশ্চিমাদের শত্রু | মোঃ নাসির উদ্দিন ৮৪
- জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট মোকাবেলায় পরিবেশসম্মত কৃষি | সাহারা বেগম ৮৮
- প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন | দেবদাস বাড়ই ৯৪
- ফিরে দেখা আন্ধারমানিক | পাপিয়া হালদার ৯৬
- নোনা জলের রূপকথা | নিগার সুলতানা সুমী ৯৯
- সুন্দরবনের কাদামাটির লাল সৈনিক | মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন ১০১
- রহস্যময় বঙ্গোপসাগর | বীনা বিশ্বাস ১০৩
- বাংলাদেশের বাস্তুতন্ত্রে সুন্দরবনের ভূমিকা | শেফালী মন্ডল ১০৬
- সুন্দরবন | জান্নাতুল ফেরদৌস রাইয়া ১০৮
- মোংলার বিলিয়ন ডলার শিল্প | মো : আব্দুল্লাহ হাওলাদার ১১০
- বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা | প্রীতি বিশ্বাস ১১২
- ART | Oiswrjyo Halder ১১৫

কবিতা

- ভাষা বিড়ম্বনা | মনোজকান্তি বিশ্বাস ১১৭
- শৈশব স্মৃতি | নন্দ কিশোর পাল ১১৮
- ঋতুর আগমন | সানজানা ১১৯
- মোংলা সরকারি কলেজ | ফাতিহা আক্তার ইমি ১২০
- কবিতা তুমি কী? | ইফসানা সুলতানা স্বর্ণালী ১২১
- গর্ব | জান্নাত নাহার ১২২
- প্রাপ্তি | বিচিত্র পোদ্দার ১২৩
- কলেজের দিনগুলো | হাওলাদার ইমতিয়াজ হোসাইন ১২৪
- পুথি, মোংলা | তমা মন্ডল ১২৫
- কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ ১২৯
- কলেজের কর্মচারীবৃন্দ ১৩২
- কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আলোকচিত্র ১৩৩

এক নজরে মোংলা সরকারি কলেজ

কলেজের নাম	:	মোংলা সরকারি কলেজ
প্রতিষ্ঠাকালীন নাম	:	মোংলা কলেজ
প্রতিষ্ঠার তারিখ	:	১৮/০৫/১৯৮১ খ্রি.
জাতীয়করণ	:	৩০/০৩/২০১৬ খ্রি.
কলেজের EIIN	:	১১৫০২১
ডিগ্রি কোড	:	০১১০
এইচ এস সি কেন্দ্র-কোড	:	মোংলা-২৩৯
কলেজ ই-মেইল	:	monglagovtcollege1981@gmail.com
	:	c0110@nu.ac.bd
কলেজ ওয়েবসাইট	:	www.monglagovtcollege.edu.bd
	:	www.mongla.college.gov.bd
একাদশ শ্রেণির প্রথম অনুমোদন	:	০১/০৭/১৯৮২ খ্রি.
স্নাতক (পাস) শ্রেণির প্রথম অনুমোদন	:	০১/০৭/১৯৯২ খ্রি.
স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রথম অনুমোদন	:	০১/০৭/২০১১ খ্রি.
বাগেরহাট জেলায় শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি	:	২০০৪ খ্রি.
প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ	:	জনাব সুনীল কুমার বিশ্বাস
বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা	:	ছাত্র– ৯১১, ছাত্রী– ৮৫০ মোট– ১৭৬১
মোট জমির পরিমাণ	:	৫.২১ একর
ভবন	:	বিজ্ঞান ভবন– ৩ তলা, বাণিজ্য ভবন– ২ তলা, একাডেমিক ভবন– ৫ তলা, কলা ভবন– ২ তলা, গ্রন্থাগার ভবন– ২ তলা
খেলার মাঠ	:	১টি
শহিদ মিনার	:	১টি
পুকুর	:	১টি
আইসিটি ল্যাব	:	১টি

❖ অধ্যক্ষবৃন্দের কর্মকাল

১। জনাব সুনীল কুমার বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ ১৮/০৫/১৯৮১ খ্রি. থেকে ২৬/১১/২০০৪ খ্রি.

২। জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার ০১/০৭/২০১০ খ্রি. থেকে ২৯/০৩/২০১৬ খ্রি.

৩। অধ্যাপক রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ২৩/০২/২০২৩ খ্রি. থেকে ৩০/০৫/২০২৩ খ্রি.

৪। অধ্যাপক কে এম রব্বানী ২৯/১০/২০২৩ খ্রি. থেকে বর্তমান

❖ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষবৃন্দের কর্মকাল

১। জনাব তৈয়াবুর রহমান গাজী ২৭/১১/২০০৪ থেকে ০৯/০৫/২০০৮ খ্রি.

২। জনাব সুশীল কুমার সরকার ১০/০৫/২০০৮ থেকে ৩০/০৬/২০১০ খ্রি.

৩। জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার, অফিসার ইন চার্জ ৩০/০৩/২০১৬ খ্রি. থেকে ০৪/০৩/২০২২ খ্রি.

৪। জনাব কুবের চন্দ্র মন্ডল ০৫/০৩/২০২২ খ্রি. থেকে ২২/০২/২০২৩ খ্রি.

৫। জনাব মল্লিক অহিদুজ্জামান ৩০/০৫/২০২৩ খ্রি. থেকে ৩১/০৮/২০২৩ খ্রি.

৬। জনাব শেখ আনোয়ার হোসেন ৩১/০৮/২০২৩ খ্রি. থেকে ২৮/১০/২০২৩ খ্রি.

❖ উপাধ্যক্ষের কর্মকাল

১। জনাব বিভাষ চন্দ্র বিশ্বাস ০১/০৭/২০১০ থেকে ০৭/০৩/২০১৬ খ্রি.

মাদকাসক্তি-একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা

শ্যামা প্রসাদ সেন
প্রভাষক, সমাজকর্ম বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজব্যবস্থার সার্বজনীন সমস্যা হলো মাদকাসক্তি। বর্তমান সময়ে মাদকাসক্তি এক ভয়াবহ বৈশ্বিক সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। মাদকের ব্যাপক প্রসার সমগ্র মানবজাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তরুণ সমাজের জন্য মাদকাসক্তি এখন এক মরণফাঁদ। মাদকের ছোবলে ঝরে যাচ্ছে অনেক তাজা প্রাণ, নষ্ট হচ্ছে অসংখ্য তরুণের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এই ঘাতক ব্যাধিতে আসক্ত হয়ে কলুষিত হচ্ছে সমাজ, দেশ ও জাতি, পৃথিবীর জন্য অপেক্ষা করছে এক মর্মান্তিক পরিণতি। এ সমস্যা বাংলাদেশে নতুন কোনো ঘটনা না হলেও দিন দিন এর মাত্র বেড়ে চলেছে। এর ব্যাপক বিস্তৃতি ও ধ্বংসাত্মক প্রভাবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বাংলাদেশের গোটা সমাজ তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন।

বাংলাদেশে মাদক বিস্তারের অন্যতম কারণ হলো এর ভৌগলিক অবস্থান। ১৯৫০-এর দশক থেকেই বাংলাদেশ মাদক পাচারের ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে অবস্থিত মাদক উৎপাদনের জোন গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল (মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও লাওস) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার গোল্ডেন ক্রিসেন্ট (ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান) এবং গোল্ডেন ওয়েজ (ভারতের হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, অরুণাচল, নেপাল ও ভুটানের কিছু অংশ) এর একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় এদেশের ভেতর দিয়ে মাদক পাচার হয়ে থাকে। এছাড়াও ভারত ও মায়ানমারের সাথে দেশের ৩২টি সীমান্তবর্তী জেলা রয়েছে। ফলে মাদকদ্রব্য চোরাচালানের আন্তর্জাতিক রুট হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে বাংলাদেশ অন্যতম মাদক ব্যবহারকারী দেশে পরিণত হয়েছে। তাছাড়াও বাংলাদেশের কিছু কিছু জেলায় গাঁজার চাষ হয়; যেমন- নওগাঁ, রাজশাহী, জামালপুর, নেত্রকোণা, কক্সবাজার, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি ইত্যাদি। তবে চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় সবচেয়ে বেশি গাঁজার চাষ হয়ে থাকে। ফলে সীমান্তবর্তী এলাকাসহ সারা দেশেই মাদকদ্রব্য খুবই সহজলভ্য। বাংলাদেশে যে সব মাদকদ্রব্য বেশি পাওয়া যায় তার মধ্যে আফিম, হেরোইন, ফেনসিডিল, পেথিড্রিন, গাঁজা, চরস, ভাং, ইয়াবা ট্যাবলেট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যেসব মাদক উদ্ধার করেছে সেগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী আইস পিল বা ক্রিস্টাল মেথ ও এমডিএমএ (মেথাইলিন ডাই-অক্সি মেথা অ্যাম্ফেটামিন) নিয়মিত

ঢুকছে বাংলাদেশে। এর বাইরে ধরা পড়েছে হ্যালুসিনেশন সৃষ্টিকারী মাদক এলএসডি, ম্যাজিক মাশরুম, ডিএমটি (ডাইমিথাইলট্রিপটামিন) ও ডিওবি। মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা ও আইস পিল এবং ভারত সীমান্ত দিয়ে ফেনসিডিল ঢুকছে বহু বছর ধরে। তবে নতুন নতুন এই মাদক ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও কানাডা থেকে পার্সেল হিসেবে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ডার্কওয়েবে বিটকয়েনের মাধ্যমে এগুলো কেনে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৮৩ লক্ষ মানুষ মাদকাসক্ত। বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের ৯৩.৯ শতাংশ পুরুষ এবং ৬.১ শতাংশ মহিলা। মাদকাসক্তদের মধ্যে শিক্ষার্থী ও তরুণ বেকার শ্রেণির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ হার ৫৬.১ শতাংশ। মাদকের প্রতি আসক্তি বিচারে বেশি ব্যবহৃত মাদক হলো হেরোইন। ব্যবহারকারীদের ৩৪.০১ শতাংশ হেরোইনে, ২৭.৯২ শতাংশ ইয়াবায়, ১৯.২৯ শতাংশ ক্যানাবিসে (গাঁজা), ৩.০৫ শতাংশ ফেনসিডিলে, ১.০২ শতাংশ ঘুমের বড়িতে ও ১.০২ শতাংশ অ্যালকোহলে আসক্ত। এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলাদেশে মাদকাসক্তি যে বর্তমানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

বাংলাদেশে মাদকাসক্তির ব্যাপক বিস্তৃতির ক্ষেত্রে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। তবে মূলত এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও মাদকের সহজলভ্যতা মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ। বিশ্বের মাদক উৎপাদনকারী দেশ ও মাদক চোরাচালানের জন্য ব্যবহৃত রুটের (গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল) এর কাছাকাছি অবস্থানের কারণে মাদকদ্রব্য অতি সহজলভ্য। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এ দেশের হাট-বাজারের চায়ের দোকানে পর্যন্ত মাদক কিনতে পাওয়া যায়।

সাধারণত প্রথম মাদক গ্রহণের ক্ষেত্রে বন্ধু বা সঙ্গীদের উৎসাহ ও কৌতূহল প্রধানত দায়ী। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, মাদকসেবীদের ৮৫.৭ শতাংশ বন্ধুদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মাদকাসক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও ইন্টারনেটের এই যুগে ভিনদেশীয় অপসংস্কৃতির ফলেও এ দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা হতাশায় যেমন মাদকাসক্ত হচ্ছে তেমনি ধনী পরিবারের সন্তানেরাও ফ্যাশন হিসেবে মাদকাসক্ত হচ্ছে। তরুণ-তরুণীদের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ দেখা যায়, কেউবা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অথবা কেউবা দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ায় সে জ্বালা দূর করতে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। আবার কেউবা বেকার জীবনে হতাশাগ্রস্থ হয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির নোংরামি ও অস্থিরতার কারণে অনেক শিক্ষার্থী বিপথগামী হয়ে মাদকাসক্ত হচ্ছে। মাদকাসক্তির অন্যান্য কারণগুলো হলো– সচেতনতার অভাব, পিতা-মাতার স্নেহের অভাব ও সন্তানের উপর নিয়ন্ত্রণহীনতা, দাম্পত্যকলহ, দাম্পত্যবিচ্ছেদ, ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা, সুস্থ বিনোদনের অভাব, আইন প্রয়োগে শিথিলতা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সর্বত্র মাদকের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের স্বাভাবিক অবস্থাকে বিশৃঙ্খল করে তুলছে। মাদকের নীল ছোবলে ঝরে যাচ্ছে অনেক সম্ভাবনাময় তাজা প্রাণ। তরুণ সমাজের এক বিরাট অংশ ক্রমাগত মাদক গ্রহণের ফলে অদক্ষ ও অকর্মণ্য গোষ্ঠিতে পরিণত হচ্ছে। মাদকের ভয়ানক থাবায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেশের সম্ভাবনাময় আগামী দিনের জাতির কর্ণধার যুবসমাজ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাদকসেবীদের ৭০ শতাংশের বয়স ২১-৩০ বছরের মধ্যে। ফলে উন্নয়নের মূল অনুঘটক মানব সম্পদকে ধ্বংস করে দিচ্ছে মাদকাসক্তি।

মাদকাসক্তির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতির হিসাব চমকে যাওয়ার মতো। প্রতিবছর তামাক ও মাদকজাত দ্রব্যের পিছনে বাংলাদেশে আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে পদ্মা সেতুর মতো ৭-৮টি বৃহত্তর অবকাঠামো তৈরি করা সম্ভব। মাদকের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে এ সব মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা চুরি, ডাকাতি, লুট, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, চোরাচালান, জুয়া, খুন, ঘুষ, দুর্নীতির মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। পুলিশের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৬২ শতাংশ চুরি, ৩৮ শতাংশ ছিনতাই, ১৪ শতাংশ ডাকাতি ও ২০ শতাংশ অবৈধ যৌন সম্পর্ককারী অপরাধী মাদকসেবী। তাছাড়া কিশোরদের একটা অংশও পতিতালয়ে গমন, পর্ণোগ্রাফির প্রতি আসক্তি, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, ধর্ষণ ইত্যাদি কিশোর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও মাদক ব্যবসায়ীরা সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত করে দিচ্ছে।

মাদকাসক্তি একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পরিবারে কোনো একজন সদস্য মাদকাসক্ত হলে পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। এছাড়া পারিবারিক অশান্তি, দাম্পত্য কলহ ও বিচ্ছেদ, আত্মহত্যা, পারিবারিক ভাঙন, শিশু ও বৃদ্ধদের নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি প্রকট আকার ধারণ করছে। মাদকাসক্ত সন্তানের হাতে বাবা-মা, পিতার হাতে সন্তান, স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন হওয়ার মতো বেশকিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে মাদকের ভয়াবহতা দেখিয়ে দিচ্ছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে সড়ক দুর্ঘটনা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গেছে। এর প্রধান কারণ মাদকাসক্তি। ২০২০ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, চালকদের ৬০ শতাংশই মাদকাসক্ত।

মাদকাসক্ত ব্যক্তির করুণ পরিণতি হলো মৃত্যু। মাদকদ্রব্যের রাসায়নিক ক্রিয়া ফুসফুস, মস্তিষ্ক, যকৃত, কিডনি ও স্নায়ুতন্ত্রকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে, যা তাকে অকালমৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। এছাড়া একই সূচ ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে বিভিন্ন মাদক গ্রহণের ফলে AIDS, হেপাটাইটিস B, C-সহ বিভিন্ন রক্তবাহিত রোগ দ্রুত সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে সমাজে অকালমৃত্যুর হার বেড়ে গেছে।

মাদকাসক্তির নীল ছোবল যতটা না দৃশ্যমান ক্ষতি করছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করছে অদৃশ্যভাবে। নীরব দংশনে তিলে তিলে আমাদের পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধকে একবাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে এই মাদকাসক্তি।

তাই এই ভয়াবহ সমস্যাটি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮ (২০২০ সালে সংশোধিত) নামক একটি পূর্ণাঙ্গ আইন রয়েছে। এ আইনে মাদকদ্রব্য উৎপাদন, ব্যবহার, সরবরাহ, বহন ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এ আইন ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে 'Zero Tolerance' নীতি অনুসরণ করে এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া ডোপ টেস্ট ২০২৬ বিধি জারি করা হয়েছে। এ বিধিতে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য নানা ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র প্রতি বছর ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবসে র‌্যালি, সভা, সমাবেশ করলেই হবে না। সারা বছরই গণসতেনতামূলক নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। পরিশেষে, আসুন আমরা সবাই মাদককে 'না' বলি, সুস্থ-সবল জীবনযাপন করি, সুস্থ-সবল মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি।

জেন-জি প্রজন্ম বনাম আমরা

এস,এম, মাহবুবুর রহমান
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

প্রতিটা মানুষ তার ঘটনাবহুল জীবনের স্মৃতিচারণ করলেই তার বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন এবং পরবর্তীতে তার চলমান জীবনের সাথে বর্তমান প্রজন্মের অর্থাৎ জেন-জি প্রজন্মের চিন্তা-ধারা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, জীবনযাপনের তুলনামূলক পর্যালোচনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। তদ্রুপ আমার লেখনীতে আমাদের ছেলেবেলায় লেখাপড়া, খেলাধুলা, বিনোদন এবং নাগরিক সুবিধাসমূহ আলোচনার মাধ্যমেই বর্তমান প্রজন্ম অর্থাৎ জেন-জি প্রজন্মের সাথে আমাদের অবস্থান তুলে ধরছি।

প্রজন্ম বলতে সাধারণ অর্থে আমরা কি বুঝি সে বিষয়ে আগে আলোকপাত করি–

ঐতিহাসিকভাবে একটি গড় হিসেবে প্রজন্ম বলতে ২৫ বছরের ব্যবধান ধরা হতো কিন্তু এটা ধ্রুব সত্য নয়। সময়ের সাথে সাথে এই ব্যবধানের বিষয়টি পরিবর্তিত হচ্ছে। আগেকার দিনে ২০ থেকে ২৫ বছরের ব্যবধানকে আদর্শ সময় ধরা হতো কারণ মানুষ সাধারণত এই বয়সের মধ্যে পরিবার গঠন ও সন্তান জন্মদান সম্পন্ন করতো। বর্তমান বাস্তবতায় আধুনিক বিশ্বে উচ্চ শিক্ষা, ক্যারিয়ার গঠন, জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে মানুষ দেরিতে সন্তান নিচ্ছে ফলে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের ব্যবধান ২৮ থেকে ৩০ বছর বা তারও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা বিশেষকরে পশ্চিমা বিশ্বে সামাজিক পরিবর্তন বুঝাতে সাধারণত ১৫ থেকে ২০ বছরের ব্যবধানে একেকটি প্রজন্মকে সংজ্ঞায়িত করেন যেমন : জেন-জেড বা জেন-জি, মিলেনিয়ালস ইত্যাদি।

প্রজন্মের এই ব্যবধান বা Generation Gap বোঝার গুরুত্ব অনেক। চিন্তার পার্থক্য, প্রযুক্তির অভিযোজন, সামাজিক পরিবর্তন বিশেষকরে সময়ের সাথে সাথে মানুষের মূল্যবোধ, পোশাক এবং ভাষার পরিবর্তন এই ব্যবধানের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়। সহজ কথায় বলা যায়, ২৫ বছরের ব্যবধানের ধারণাটি একটি গাণিতিক গড়। বাস্তব জীবনে এটি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে। সার্বিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে আমার লেখনীতে সত্তর দশকের প্রজন্ম এবং জেন-জি প্রজন্মের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করছি।

সত্তর দশকে জন্ম নেয়া প্রজন্ম যাদের আমরা জেনারেশন এক্স-এর শেষ ভাগ বা আর্লি মিলেনিয়াল হিসেবে দেখি এবং বর্তমানের জেন-জি (Gen Z) যাদের জন্ম ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মাঝে তাদেরকে জেন-জি প্রজন্ম হিসেবে মনে করা হয়। এই দুই প্রজন্মের মধ্যে জীবনবোধ ও জীবনযাত্রার

বিশাল এক পার্থক্য রয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় চিন্তা ও মনস্তত্ত্বে যেমন বড় বদল এসেছে, তেমনি কিছু শাশ্বত মিলও রয়ে গেছে।

নিচে এ সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত তুলে ধরা হলো :

❖ জীবনযাপন ও প্রযুক্তির প্রভাব :

সত্তর দশক : এই প্রজন্মের শৈশব কেটেছে যান্ত্রিকতাহীন এক পৃথিবীতে। খেলার মাঠ, বিকেল বেলার আড্ডা এবং বিটিভির নির্দিষ্ট সময়ের অনুষ্ঠান ছিল বিনোদন। প্রযুক্তির অভাব তাদের মধ্যে ধৈর্য ও অপেক্ষার শক্তি তৈরি করেছিল। যেমন– চিঠির উত্তর আসা বা প্রিয় গানের জন্য রেডিয়োর অপেক্ষা।

জেন-জি : এদের জন্মই হয়েছে ডিজিটাল যুগে। 'ইনস্ট্যান্ট' সব কিছুতে এরা অভ্যস্ত। তথ্যের প্রাচুর্য এদের যেমন স্মার্ট করেছে, তেমনি এদের মধ্যে তীব্র অস্থিরতা ও স্ক্রিন-নির্ভরতা তৈরি করেছে। এদের বিনোদন এখন গ্লোবাল এবং হাতের মুঠোয়।

ছবি-১

ছবি-২

জেন-জি পূর্ব প্রজন্মের বহুল ব্যবহৃত যোগাযোগ চিত্র : # ছবি-১: প্রায় হারিয়ে যাওয়া নৌ-রুটে যোগাযোগের উন্নত মাধ্যম প্যাডেল চালিত স্টিমার (রকেট নামে পরিচিত) # ছবি-২: প্রায় হারিয়ে যাওয়া পত্র বা চিঠি যোগাযোগের অবলম্বন ডাক বাক্সের ব্যবহার

❖ উভয় প্রজন্মের লেখাপড়া :

সত্তর দশকের প্রজন্ম বা তারপূর্ব প্রজন্ম থেকেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বোর্ড নির্ধারিত বইয়ের সিলেবাসের মধ্যেই বেশির ভাগ শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা সীমাবদ্ধ ছিল। তবে উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে কিছু কিছু পরিবারে অতিরিক্ত জ্ঞান আহরণের জন্য সিলেবাস বহির্ভূত পড়ালেখার প্রচলনও ছিল। তখনকার সময়ে ক্যালকুলেটরের ব্যবহার খুবই সীমিত ছিল। নিয়মিত ক্লাস করা ও শিক্ষকদের নির্দেশনাই ছিল শিক্ষার্থীদের কাছে বড় পাওয়া। প্রাইভেট পড়ার

প্রচলন ছিল না বললেই চলে।বিনোদন হিসেবে খেলাধুলা ও আড্ডাই ছিল শিক্ষার্থীদের কাছে বড় প্রাপ্তি। এ সময়কালে উচ্চশিক্ষার হার ছিল খুবই কম।

জেন-জি প্রজন্মের কাছে বোর্ড নির্ধারিত বই ছাড়াও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ইন্টারনেট সুবিধাকে ব্যবহার করে কম্পিউটার ও আধুনিক স্মার্ট ফোন থেকে পড়াশুনার অনেক কিছুই সহজ প্রাপ্য হয়েছে। জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের কাছে ক্লাসশিক্ষক একমাত্র অবলম্বন নয়। মোবাইল বা কম্পিউটার ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে অনেকটা ক্লাসে অমনোযোগিতা ও ক্লাস বিমুখতা বেড়েছে ফলে প্রাইভেট নির্ভরশীলতা বেড়েছে। স্মার্ট মোবাইল বা কম্পিউটারই এখন জেন-জি প্রজন্মের বিনোদনের বড় মাধ্যম হয়েছে। বলা চলে ইন্টারনেট আসক্তিতে এই প্রজন্মের বড় একটা অংশ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। এ প্রজন্মের উচ্চশিক্ষার হার অনেকটা বেশি।

ছবি-৩

ছবি-৪

জেন-জি প্রজন্মের সময়কালে বহুল ব্যবহৃত যোগাযোগ চিত্র : # ছবি-৩ : বর্তমানে আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যম মেট্রোরেল # ছবি-৪ : বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহৃত স্মার্ট মোবাইল ফোন।

❖ পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিকীকরণ :

সত্তর দশক : তখন যৌথ পরিবার বা বড় পরিবারের চল ছিল। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আদেশ মানার প্রবণতা ছিল প্রশ্নাতীত। পারিবারিক সিদ্ধান্ত সাধারণত অভিভাবকরাই নিতেন। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো ছিল সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জেন-জি : এই প্রজন্ম অনেক বেশি ব্যক্তিবাদী (Individualistic)। তারা পরিবারের মধ্যেও নিজের 'প্রাইভেসি' বা নিজস্ব পরিসর খোঁজে। তবে তারা তাদের বাবা-মায়ের সাথে বন্ধুর মতো মিশতে পছন্দ করে, যা আগের প্রজন্মে বিরল ছিল। এখন আত্মীয়তার চেয়ে 'অনলাইন কমিউনিটি' বা বন্ধুদের গুরুত্ব এদের কাছে বেশি।

❖ চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ :

সত্তর দশক : এই প্রজন্মের কাছে ক্যারিয়ার মানেই ছিল স্থায়িত্ব (যেমন সরকারি চাকরি বা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের ক্যারিয়ার)। সামাজিক মর্যাদা ও সংহতি ছিল বড় কথা। তারা সাধারণত লোকলজ্জা বা "লোকে কী বলবে" এই ভয়ে অনেক কিছু মেনে নিত।

জেন-জি : এরা অনেক বেশি প্রগতিশীল এবং স্পষ্টভাষী। মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health), লিঙ্গ সমতা এবং পরিবেশ রক্ষা নিয়ে এরা অনেক বেশি সচেতন। তারা প্রথাগত ক্যারিয়ারের চেয়ে প্যাশন বা ফ্রিল্যান্সিংকে বেশি গুরুত্ব দেয়। "লোকে কী বলবে" তার চেয়ে "আমি কী চাই" এটিই তাদের কাছে মুখ্য।

❖ চিন্তাধারার মিল :

এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিছু জায়গায় দুই প্রজন্মের মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে।

বিদ্রোহী চেতনা : সত্তরের দশকের প্রজন্ম প্রচলিত শোষণ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বা বিশ্বজুড়ে হিপ্পি মুভমেন্ট, জেন-জি ঠিক তেমনি জলবায়ু পরিবর্তন, বৈষম্য এবং মানবাধিকার নিয়ে প্রচণ্ড সোচ্চার।

পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা : দুই প্রজন্মই নিজেদের সময়কার 'স্ট্যাটাস কো' বা প্রচলিত নিয়ম ভাঙতে পছন্দ করে।

শৈল্পিক ঝোঁক : সত্তরের দশকে যেমন গান, কবিতা ও থিয়েটারের জোয়ার ছিল, জেন-জি-র মাঝেও কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ও ডিজিটাল আর্টের প্রতি প্রবল ঝোঁক দেখা যায়।

সত্তরের দশকের প্রজন্মের প্রাপ্তি : তারা একটি নতুন দেশ বাংলাদেশ পেয়েছে, আদর্শিক রাজনীতি এবং মানবিক সম্পর্কের গভীরতা পেয়েছে। তাদের ছোটবেলা কেটেছে প্রকৃতির খুব কাছে ফলে গভীর মানবিক সম্পর্ক, ধৈর্য, প্রকৃতির সাথে নিবিড় সংযোগ ঘটেছে।

অপ্রাপ্তি : আধুনিক প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের সুযোগ তারা শুরুতে পায়নি। অনেক স্বপ্ন যুদ্ধের পরবর্তী অস্থিরতায় হারিয়ে গেছে। তথ্যের অভাব, আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা।

জেন-জি প্রজন্মের প্রাপ্তি : হাতের মুঠোয় পুরো পৃথিবী। তারা প্রযুক্তিগতভাবে অত্যন্ত দক্ষ এবং গ্লোবাল সুযোগের মালিক। তারা অনেক বেশি সচেতন ও স্বাধীনচেতা। অফুরন্ত তথ্য, বৈশ্বিক সুযোগ, প্রযুক্তির দক্ষতা, বাক-স্বাধীনতা।

অপ্রাপ্তি : মানসিক অস্থিরতা, একাকীত্ব এবং সাইবার বুলিংয়ের মতো সমস্যা তাদের নিত্যসঙ্গী। শারীরিক খেলাধুলা ও ধৈর্য ধরার ক্ষমতার এক বিশাল ঘাটতি রয়ে গেছে।

❖ জীবনদর্শন: স্থায়িত্ব বনাম অভিজ্ঞতা :

সত্তরের দশকে বেড়ে ওঠা মানুষের কাছে জীবন ছিল 'গুছিয়ে নেওয়ার' নাম। ঘর করা, সঞ্চয় করা এবং ভবিষ্যতের জন্য টিকে থাকা ছিল মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে, জেন-জি-র কাছে জীবন মানে 'অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা'। তারা সঞ্চয়ের চেয়ে ভ্রমণে বা নতুন কিছু শেখায় বেশি গুরুত্ব দেয়।

সারকথা : সত্তরের প্রজন্ম শিখিয়েছে কীভাবে ধৈর্য ধরে ভিত্তি গড়তে হয়, আর জেন-জি শেখাচ্ছে কীভাবে দ্রুত বদলে যাওয়া পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়।

❖ মিল কোথায়? :

বিশাল পার্থক্য থাকলেও কিছু জায়গায় দুই প্রজন্মের অদ্ভুত মিল আছে :

পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা : সত্তর দশকের মানুষরা যেভাবে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখতেন, জে-এনজি প্রজন্মও নিজের মতো করে পৃথিবী বদলাতে চায়।

সংগ্রাম : সত্তর দশকের সংগ্রাম ছিল অভাবের বিরুদ্ধে, আর জেন-জি-র সংগ্রাম হলো তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেকে টিকিয়ে রাখার।

মূল শিকড় : দিনশেষে উভয় প্রজন্মই আপনজনের কাছে একটু মানসিক সমর্থন ও ভালোবাসা খোঁজে, যদিও প্রকাশের ভঙ্গি আলাদা।

উপসংহার :

স্বল্প কথায় ও বিশ্লেষণে বলা যায় সত্তর দশকের মানুষরা হলেন 'সেতু', যারা এনালগ ও ডিজিটাল দুই পৃথিবীই দেখেছেন। আর জে-এনজি হলো 'ভবিষ্যৎ', যারা এই পৃথিবীকে নতুন সংজ্ঞায় সাজাচ্ছে। পারিবারিক বন্ধনের ক্ষেত্রে সত্তর দশকের মানুষের উচিত আধুনিকতাকে বোঝা, আর জে-এনজি-র উচিত বড়দের অভিজ্ঞতার গভীরতাকে সম্মান করা। নতুন-পুরাতনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাবে আমাদের এই প্রিয় দেশ এবং আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত ও মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত হবে আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি- এমন একটি স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি ও দেখতে চাই।

ইসলামে নারী মর্যাদা ও অধিকার

আ ই শ ম বাকী বিল্লাহ
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

ভূমিকা :

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন (আল ইমরান ১৯)। আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানবজাতি। নারীজাতি হল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হতো এবং মানুষ হিসেবে তাদের কোনো মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হতো না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারীজাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক' (বাকারা ১৮৭)। তিনি আরও বলেন, 'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা (আদম) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ এতদুভয় হতে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাকে এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হতেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন' (নিসা ১)।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

মর্যাদা অর্থ– গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারও অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথ ভাবে প্রদান করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়। অথবা কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক বোঝা, দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর

চাপিয়ে দেওয়া হয়, তার অবদানসমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয় তাহলে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকারসমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদানসমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

ইসলামপূর্ব যুগে নারীর অবস্থান :

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত এবং অধিকারহারা, মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (তাকভীর ৮-৯)।

সে যুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হতো। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহরদানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদি দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হতো। এ গর্হিত কাজ হতো বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদের ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপ মুক্ত থাকতে চায়' (নূর ৩৩)। উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত করা হতো। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হতো না। এ-জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারীজাতির উপর করা হতো।

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হতে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘর ছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদায় যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ন করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংঙ্খলে বন্দি করে ফেলেছে। পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদের নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে হিসাবে গড়ে তুলেছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদের অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন-নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারীবিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুবসমাজ এমনকি বৃদ্ধদের ও মানসিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদের তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নিচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায় নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারীজাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তাআলা আদি পিতা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হতে আদি মাতা হাওয়া (আঃ) কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন "হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। (হুজরাত ১৩)। মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলুকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (বনি ইসরাইল ৭০)। আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'স্ত্রীদের ও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (বাকারা ২২৮)।

ইসলামে নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলে–

(ক) **বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :**

জাহেলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনোরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূল্যোৎপাটন করে নারী ও পুরুষের বৈবাহিত সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তবে যে নারী তোমাদের পছন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশঙ্কা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারব না তাহলে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হতে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ (নিসা ৩)।

(খ) **স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :**

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পছন্দ মত স্বামী গ্রহণের কোনো অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হতে। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূবক কোনো নারীর স্বামী হতে পারবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না। (বাকারা ২৩২)।

(গ) **স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :**

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোনো একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোষাক' (বাক্বারাহ ১৮৭)।

রাসুল (সঃ) বলেন 'তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।

শুধু তাই নয় নবী করিম (সঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর' (নিসা ১৯)।

(ঘ) **মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :**

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে' (নিসা ৪)। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন, 'যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে জরুরি তাহলো ঐ শর্ত-যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জা স্থান হালাল কর'। অর্থাৎ 'মোহর'।

(ঙ) **ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার ও সম্পদের মালিকানা :**

ইসলাম ধর্মে নারীদের সম্পদের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী ধারণা। মানবসভ্যতার ইতিহাসে বহু সমাজে নারীরা দীর্ঘদিন সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার বা সম্পদ অর্জনের অধিকার একটি সুনির্দিষ্ট এবং ভারসাম্যপূর্ণ বিধান যা আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিধানের মাধ্যমে নারীকে প্রথমবারের মতো সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হয়েছিল। এমন এক সময়ে এই বিধান প্রবর্তিত হয়েছিল, যখন বিশ্বজুড়ে অনেক সমাজে নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার তো দূরের কথা, নিজেরাই সম্পত্তির অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। অথচ নারী পরম শ্রদ্ধেয় মা, আদরের বোন, প্রেমময় স্ত্রী, স্নেহভাজন কন্যা হিসেবে পুরুষের চিন্তাজগৎকে আলোকিত করে। অঘোষিতভাবে মহান আল্লাহর সৃষ্টির সহজাত প্রক্রিয়ায় নারী ব্যতীত বা নারীর সক্রিয় উপস্থিতি ছাড়া একটি সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ ও সৃজনশীল সমাজ আশা করা যায় না। তাই ইসলাম নারীকে শুধু সামাজিক মর্যাদাই দেয়নি, দিয়েছে অর্থনৈতিক অধিকারও।

ইসলামে নারীর সম্পদের অধিকারের প্রধান ভিত্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে উত্তরাধিকার, মোহরানা, উপার্জনের অধিকার এবং সম্পত্তি ভোগ ও ব্যবস্থাপনার স্বাধীনতা। পিতা, স্বামী বা সন্তানের সম্পত্তিতে নারী নির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকার পায়। কন্যা, স্ত্রী, মা– প্রত্যেক পরিচয়ে নারীর জন্য কুরআনে নির্ধারিত অংশ রয়েছে।

ইসলাম পূর্ব সমাজে যৌতুকের অভিশাপ থাকলেও ইসলামে যৌতুক নামে কোনো অধ্যায় নেই। অধিকন্তু বিয়েতে যৌতুকের সম্পূর্ণ উল্টো ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। পুরুষদের কষ্টার্জিত অর্থ বিয়ের সময় বাধ্যতামূলকভাবে মোহরানা হিসেবে তুলে দিতে হয় নারীর হাতে। ইসলামে নারীর মোহরানা তার ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় এবং স্বামী বা অন্য কেউ তার ওপর অধিকার রাখতে পারে না।

ইসলামের আগমনের আগে নারীর সম্পত্তির অধিকার ছিল না। অথচ ইসলামের নবী, বিশ্বমানবতার পরম বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ১৪০০ বছর আগে মরুভূমির প্রান্তে দাঁড়িয়ে উত্তরাধিকারসহ সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের কথা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। একজন পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নারী তিনি বিবাহিত হন বা না হন কারো সাথে পরামর্শ ছাড়াই সম্পদের মালিক হতে পারেন, মালিকানা হস্তান্তরও করতে পারেন। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী একজন স্বাধীন ব্যক্তি; তার উপার্জন, সম্পদ ও উত্তরাধিকারের ওপর তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

নারীর রয়েছে তার মাতা-পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে ন্যায়সঙ্গত অধিকার। উত্তরাধিকারে নারীর অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে পবিত্র কোরআন। যদি কোনো নারীর কোনো ভাই না থাকে তাহলে তিনি (একা হলে) পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন। আর যদি তারা দুই বোন বা ততধিক হন এবং কোনো ভাই না থাকে তাহলে তারা তাদের পিতা বা মাতার সমুদয় সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবেন।

যদি এক বোন এবং এক ভাই হয় তাহলে একজন ভাইয়ের অংশের অর্ধেক পাবেন একজন বোন। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। আর যদি শুধু নারীই হয় দুইয়ের অধিক তাহলে তাদের জন্য ওই ত্যাজ্য সম্পত্তির তিনভাগের দুই ভাগ। আর যদি (কন্যা) একজনই হয় তাহলে সে পাবে অর্ধেক।" (সুরা নিসা-১১ আয়াত)। স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও রয়েছে নারীর অধিকার। যদি কারো স্বামীর ইন্তেকাল হয় আর স্বামীর কোনো সন্তান না থাকে তাহলে স্বামীর সমুদয় সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবেন তার স্ত্রী। আর যদি স্বামীর সন্তান থাকে তাহলে স্ত্রী পাবেন এক-অষ্টমাংশ। পবিত্র কোরআনে -এরশাদ হয়েছে, "স্ত্রীদের জন্য তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য হবে ওই সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ।" (সুরা নিসা-১২ আয়াত)। সন্তানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও রয়েছে মায়ের অধিকার। মা জীবিত থাকা অবস্থায় সন্তানের মৃত্যু হলে সন্তানের কোনো সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে সেই সন্তানের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পাবেন মা। আর যদি মৃত সন্তানের কোনো সন্তান-সন্ততি থাকে তাহলে মা সেই (মৃত) সন্তানের সম্পত্তির ছয়ভাগের এক ভাগ পাবেন। পবিত্র কোরআনুল কারিমে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন, "মৃতের কোন পুত্র থাকলে পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য (সন্তানের) ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হয়, তবে মাতা পাবেন তিন ভাগের এক ভাগ।" সুরা নিসা-১১ আয়াত।

নারী নিজে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি বা অন্য বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করতে পারেন। ইসলামের ইতিহাসে খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী, যা নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

তবে বাস্তব সমাজে অনেক সময় নারীরা তাদের ন্যায্য সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এর জন্য ইসলাম নয়, বরং সামাজিক কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দায়ী। অনেক পরিবারে কন্যাদের উত্তরাধিকার না দেওয়া বা জোরপূর্বক সম্পত্তি ত্যাগ করানো ইসলামের ন্যায়বিচারের চেতনার

পরিপন্থী।

অতএব বলা যায়, ইসলাম ধর্ম নারীদের সম্পদের অধিকারকে স্বীকৃতি ও সুরক্ষা দিয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো পারিবারিক ভারসাম্য, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এভাবেই ইসলাম সম্পত্তিতে ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নারীদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

সঠিকভাবে ইসলামের বিধান অনুসরণ করা হলে নারীর অর্থনৈতিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নারীকে দিয়েছে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান। নারীদের প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে মহানবী (স:) বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। ইসলাম ও বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (স:) বিশ্বব্যাপী নারী সমাজের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক জীবন্ত আদর্শ স্থাপন করেছেন। মানব মন ও মানব সমাজে নারী প্রগতির গোড়াপত্তন করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেন। ইসলামে নারীর স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক বাক-স্বাধীনতা আছে। নর-নারী উভয়ে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে স্বীকৃত এবং কর্মফল অনুযায়ী স্বর্গ লাভের সম অধিকার প্রাপ্য।

ইসলামের কষ্টিপাথরে নারী পুরুষের মর্যাদা ও অধিকার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলাম নারীকে শুধু পুরুষের সমঅধিকার নয় বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ থেকে নারীকে অধিক মর্যাদা দিয়েছে।

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত ঘোষণা করে ইসলাম নারী জাতিকে সর্বোত্তম মর্যাদায় ভূষিত করেছে। যে মর্যাদা পুরুষকে দেওয়া হয়নি। ইসলামে একজন নারী একজন পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ও মর্যাদার অধিকারী।

পারিবারিক জীবনে সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য থাকলেও সার্বিক মূল্যায়নে ইসলাম নারী জাতিকে পুরুষের অধিক মান-মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন, যা অন্য কোনো ধর্ম বা জাতি করেনি।

আমাদের কতই না সৌভাগ্য, মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আখ্যায়িত করেছেন, শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমার দ্বারা কিভাবে অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে পারে?

তাই আসুন না, সকল প্রকার অন্যায় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখি। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় জীবন পরিচালনার তৌফিক দান করুন, আমিন।

যৌতুক

রঞ্জিতা মন্ডল
প্রভাষক, সমাজকর্ম বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের একটি জঘন্যতম সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও সমাজ কাঠামো, অব্যবস্থা ও সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে নারীরা নানামুখী সমস্যার শিকার হয়। আর যৌতুক হচ্ছে এদেশের নারী সমাজের জন্য ভয়াবহ ও নির্মম প্রথা, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ফলশ্রুতিতে সামাজিক উন্নয়নের বাইরের কর্মসূচি সত্ত্বেও যৌতুকের মতো এক সামাজিক ব্যধির কবলে সমাজ। তাই জেন্ডার বৈষম্য আর নারী নির্যাতনের অমানবিক প্রথা হলো যৌতুক। যৌতুক প্রথা এমন একটি অর্থনৈতিক পন্থা যার মাধ্যমে অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। সহজ কথায় বলা যেতে পারে, বিয়ের সময় কিংবা বিয়ের আগে বা পরে বরপক্ষ অন্যায়ভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে যে অর্থ সম্পদ আদায় করে তাকে যৌতুক বলে। কন্যার পিতামাতা যদি যৌতুক প্রদানে অসমর্থ হয় তাহলে অমানবিকভাবে ছলে-বলে-কৌশলে তা আদায় করা হয়।

হিন্দু সমাজে অতীতে যাকে পণপ্রথা বলা হতো, বর্তমানে তা পরিবর্তিতরূপে যৌতুক প্রথা হিসেবে পরিচিত। হিন্দু আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় কন্যা পাত্রস্থ করার সময় স্মরণাতীত কাল হতে যৌতুক প্রথা চলে আসছে। প্রাচীন চীনে বিয়ের পর কনে স্বামীর ঘরে যৌতুক সঙ্গে নিয়ে যেত। এথেন্সেও বিয়ের পর কনে স্বামীর ঘরে নিয়ে যেত অর্থসম্পত্তি। সেখানে যৌতুক গ্রহণকে সামাজিক মর্যাদা হিসেবে দেখা হতো। আমাদের সমাজে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের মধ্যে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয়। এরা সরকারি বিভিন্ন পদে চাকরি পেতে থাকে। ফলে শিক্ষা সামাজিক বৈষম্যের তথা সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত বিয়ের পাত্রের মর্যাদা বেড়ে যায় এবং তখনকার সমাজে শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়া কন্যার বাবা-মা এসব নবশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাত্রকে নানারকম উপহার–উপঢৌকনে আকৃষ্ট করে জামাতা হিসেবে গ্রহণ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল সমাজেই যৌতুক প্রথার কমবেশি প্রচলন আছে। যৌতুকের কারণে সমাজজীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিবাহিত নারীর প্রতি অত্যাচার ও সহিংসতার মূল কারণ যৌতুক। যৌতুকের কারণে স্বামীর সংসারে স্ত্রীকে নানাভাবে নিগৃহীত হতে হয়। যৌতুকের দাবি পূরণ করতে না পারলে অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীকে সংসার ছাড়তে বাধ্য করা হয়। যৌতুকের কারণেই বিবাহবিচ্ছেদ ও কখনো কখনো স্ত্রীর প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে থাকে ।

বাংলাদেশের যৌতুক প্রথার কারণ হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে নির্ণয় করা যায় না, বরং সমাজের মধ্যে নিহিত নানা ধরণের সামাজিক সমস্যাই এর জন্য দায়ী। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, সম্পদের অসমবণ্টন ইত্যাদি কারণে যৌতুক প্রথা সামাজিক সমস্যার রূপধারণ করেছে। যদিও ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন ও ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত এবং যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে তথাপি এ জঘন্য প্রথা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যৌতুক প্রথার ভিত্তি সমাজের অনেক গভীরে। সমাজ জীবনে এ কুপ্রথার সাথে অনেক কারণ জড়িত। দারিদ্র, শিক্ষার অভাব, সচেতনতার অভাব, কন্যার সুখের চিন্তা, আইন প্রয়োগে শিথিলতা, নারীর পরনির্ভরশীলতা, অর্থবিত্তের প্রভাব, প্রতিষ্ঠা লাভের মনোভাব, পিতামাতার অবহেলা, নারী-পুরুষ বৈষম্য যৌতুক প্রথার অন্যতম কারণ। সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে যৌতুক নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে, যা বিয়ের আগে থেকে শুরু হয়ে চলতে থাকে। যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে কনের পরিবার নিঃস্ব হচ্ছে। আবার এ দাবি মেটাতে না পারলেই নেমে আসে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের খড়গ। যৌতুকের কারণেই অনেক নারীকেই হত্যার শিকার হতে হচ্ছে। আবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলেও অনেকে বেছে নেন আত্মহত্যার পথ।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজজীবনে যৌতুকের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। যৌতুকের কারণে বিবাহ ভেঙে যাওয়া, কন্যার উপর শারীরিক, মানসিক নির্যাতন যেন প্রতিদিনের ঘটনা। যৌতুক অর্থনীতিকেন্দ্রিক সমস্যা হলেও সামাজিক, মানসিক বিভিন্ন সমস্যার জন্মদাতা। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে এর প্রকটতা লক্ষণীয়। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশ। অতিরিক্ত জনসংখ্যা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, দাম্পত্য কলহ, কৃষি জমির অভাব, প্রযুক্তির অপ্রতুলতা, শিক্ষার অনগ্রসরতা প্রভৃতি এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে দুর্বল করে রেখেছে। ফলে যৌতুকের মতো সামাজিক কুপ্রথা এদেশে অতি সহজে অবস্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের অধিকাংশ ঘটনা খতিয়ে দেখলে যৌতুকের কারণ নির্ণীত হয়। তাই যৌতুক নিজে একটি অন্যতম সমস্যা ও অন্যান্য জটিল সমস্যার কারণ। এদেশে প্রতি ঘণ্টায় একজন নারী নির্যাতনের শিকার হয় এবং প্রতিদিন ২৪টি নারী নির্যাতনের ঘটনার মধ্যে ১০টি যৌতুক সম্পর্কিত।

একক কোনো পদক্ষেপের দ্বারা যৌতুক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। শিক্ষা বিস্তার, সচেতনতা সৃষ্টি, নারী উন্নয়ন, যুবকদের জাগিয়ে তোলা, সামাজিক উদ্যোগ, বিয়ে রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে কঠোরতা, ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে একটি ঘৃণিত প্রথা হিসেবে পরিচিত। যৌতুক নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ। যৌতুকের অভিশাপে বিবাহিত নারীর জীবনে নেমে আসে বিচ্ছেদের বেদনা; নির্যাতনে ঘটে জীবনের অবসান। তাই আমাদের সকলের উচিৎ যৌতুকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

সংযম

প্রমীলা রায়
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

সংযম একটি মহৎ গুণ। সংযমের অর্থ নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। সংযমের নিয়মটা সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংযমের শিক্ষা উন্নত ও প্রতিযোগিতামূলক জীবন যাপন ও অন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করে। সংযমের শিক্ষা আমরা পাই বাবা- মা, গুরুজন ও শিক্ষক মহাশয়দের নিকট থেকে। এছাড়া বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী পাঠের মাধ্যমে। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে চালিত করে মন। ষড়রিপুর তাড়নায় যখন মন বিভ্রান্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের পর্ব আবির্ভূত হয়। মানুষের এই সহজাত রিপুকে দমন করতে হয়। মন সংযত রাখতে অভ্যাস যোগ অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ।

পৃথিবীর উপর আমরা কত অত্যাচার করি। কিন্তু পৃথিবী সর্বাবস্থায় অবিচল। সুতরাং তাঁর নিকট থেকে আমরা শিখেছি কিভাবে ব্রতে স্থির থাকতে হয়। পাহাড় কেটে মানুষ ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট তৈরি করে। গাছ আমাদের ফল, ফুল, ছায়া, অক্সিজেন দিয়ে কতভাবে উপকার করে । তাদেরও নিজেদের প্রয়োজনে ধ্বংস করে ফেলি। সেই সঙ্গে নিজেদের সুখ সাচ্ছন্দের জন্য ঘর-বাড়ি, রাস্তাদি তৈরি করি। কিন্তু তাতে পাহাড় বা গাছগুলি নিজেদের জীবন "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়" উৎসর্গ করে থাকে। এই দেখে বুঝলাম, পরের উপকারের জন্যই আমাদের জীবন।

বর্তমানে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাসের কারণে নানা ব্যাধির উপদ্রব বাড়ছে। মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাচ্ছে। অতি লোভে ভেজাল ঔষধে মুমূর্ষু রোগীর সর্বনাশ হচ্ছে। সংযম মানুষকে লোভ, মোহ, ঈর্ষা প্রভৃতি পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের "জাপান যাত্রীর পত্র" লেখা থেকে আমরা পাই, জাপানীদের সংযমের কথা। কবি লিখেছেন, পথে দুইজন সাইকেল আরোহীর ঠোকাঠুকিতে কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলে পরস্পরের ধুলা ঝেড়ে চলে যায়। কবি বলেছেন, এমন সংযম আমাদের দেশে দুর্লভ।

আত্মসংযম, চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি, প্রাণায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে সংযম আনতে হয়। সংযম আমাদের ক্ষণিকের মোহবশে ভুল পথে চালিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। আর ভবিষতের বৃহত্তর কল্যাণের পথে দৃষ্টি রাখতে সাহায্য করে। সংযম এমন একটি অভ্যাস যা ধীরে ধীরে অনুশীলন করতে হয়। প্রথমে ছোট ছোট বিষয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। যেমন- অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখা, মিষ্টি জাতীয় খাবার পরিহার করা। রাগের মুহূর্তে শান্ত থাকার চেষ্টা করা। ধীরে ধীরে এই ছোট অভ্যাসগুলো আমাদের

সংযমী হতে সহায়তা করে। সংযমের সাথে ব্যবহার করলে, সমাজবদ্ধ মানুষের মাঝে একটি সুন্দর ও দৃঢ় মেলবন্ধন গড়ে ওঠে। একমাত্র সংযমই পারে অন্তরকে আলোকিত করতে। সমাজবদ্ধ মানুষেরা আর্তমানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। আবার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণে মানুষকে উৎসাহ প্রদান করতে পারে। যেমন- ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁর নাগরিকদের বৃক্ষরোপণে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। সংযমী ব্যক্তিরা সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে পরিচিত হন এবং অন্যের ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধশীল হন। আইন মেনে চলেন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করেন। সংযম কেবল একটি ব্যক্তিগত গুণ নয় এটি একটি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন। যে ব্যক্তি এটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং নিজের জীবনে তা অনুশীলন করতে সক্ষম হয়, তবে সে শুধু নিজের জন্য নয় সমাজের জন্যও এক মূল্যবান সম্পদ হয়ে ওঠে। সংযমই আমাদের শেখায় কিভাবে আবেগ ও যুক্তির মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষা করে একটি সুন্দর ও অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করা যায়। কবি জয় গোস্বামীর কবিতায় আমরা পাই–

“আমরা তো অল্পে খুশি,
কী হবে দুঃখ করে
আমাদের দিন চলে যায়
সাধারণ ভাত কাপড়ে।”

কাছারিঘর : গ্রামীণ আত্মার ইতিহাস

পলাশ চক্রবর্তী
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

গ্রামবাংলার ইতিহাস লিখতে গেলে কাছারিঘরের নাম না বললে সে লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মাটির দেয়াল, বাঁশের খুঁটি আর টিন কিংবা খড়ের চালের নিচে গড়ে ওঠা এই ঘরটি ছিল গ্রামীণ জীবনের বিনোদনের প্রাণকেন্দ্র। এখানে শুধু মানুষ বসত না; বসত সময়, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা সংস্কৃতি।

ভোরবেলায় কাছারিঘর নীরব থাকলেও সন্ধ্যা নামতেই প্রাণ ফিরে পেত। মাঠফেরা কৃষক, নৌকা বেঁধে আসা মাঝি হাট-ফেরা-ব্যবসায়ী সবাই ক্লান্ত শরীর নিয়ে এসে বসতো এখানে। ধোঁয়া ওঠা গুড়গুড়ি, ছিলুম আর হুক্কাতে চুমুক দিতে দিতে শুরু হতো জীবনের গল্প। কখনো কখনো চায়ের আসরও বসতো এখানে। এই গল্পেই জন্ম নিত গ্রামীণ সাহিত্য-অলিখিত, অথচ গভীর ও জীবনঘনিষ্ঠ।

কাছারিঘর ছিল গ্রামবাংলার লোকসাহিত্যের খোলা পাঠশালা। হারিকেনের অথবা কেরোসিনের কুপির আলোয় উচ্চারিত হতো পালাগান, সুন্দরবনের বনবিবির গল্প, বাঘ-কুমিরের সামনে থেকে বেঁচে আসা অথবা তাদের মুখে খাদ্য হওয়া নাম-না-জানা অনেক মানুষের লোমহর্ষক গল্প। কখনো কখনো উচ্চারিত হতো মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের খণ্ডিত অংশ। হারমোনিয়াম, ঢোলের সাথে বা কখনো খালি গলায় বাউল, জারি-সারি, ভাটিয়লি, লালনের গান,পট গান, অষ্টকের গান উচ্চারিত হতো। কারো কারো গলায় গানগুলি খুবই ভালো লাগতো আবার কারো বেসুরো গলা ছিলো কিন্তু তাদের কাছে গানটা ছিলো হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা।

এই ঘরেই বসে প্রবীণরা শোনাতেন মুক্তিযুদ্ধের গল্প, দুর্ভিক্ষের দিনের গল্প, বন্যার স্মৃতি। ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ের বাইরের এক জীবন্ত ইতিহাস রচিত হতো কাছারিঘরে। তরুণেরা শিখতো জীবনকে কেমন করে শক্ত হাতে ধরতে হয়, আর শিশুরা গল্পের রাজ্যে হারিয়ে যেত। কখনো কখনো শিশুরা বড়দের কোলে ঘুমিয়ে পড়ত।

কাছারিঘর ছিল সামাজিক ন্যায়ের প্রতীক। বিচার মানে এখানে ছিল শুধু রায় ঘোষণা নয়; বরং ভুলকে শুধরে নেওয়া, ক্ষমা আর সংশোধনের সুযোগ দেওয়া। মানুষের মন জয় করাই ছিল বিচারকের আসল সাফল্য। এই মানবিক বিচার ব্যবস্থাই গ্রমীণ সংস্কৃতিকে করেছিল সহনশীল ও সহমর্মী। এখানে ধনী-গরীবের ভেদাভেদ ছিল না। এই মাটিতে, একই পিঁড়িতে বসে শোনা হতো সিদ্ধান্ত। এই সাম্যবোধ

আজকের সমাজে ক্রমেই দুর্বল হয়ে উঠেছে। তাই কাছারিঘর কেবল একটি স্থাপনা নয়, একটি দৃর্শ্য-সহাবস্থানের দর্শন।

কালের পরিবর্তনে আজ কাছারিঘরের অনেক দরজা বন্ধ। টেলিভিশন, মোবাইল আর সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম মানুষের আড্ডাকে ঘরের ভেতরে বন্দি করে ফেলেছে। তবুও কাছারিঘরের চেতনা মানুষের মন থেকে পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। আজও গ্রাম বাংলায় কোনো কোনো সন্ধ্যায়, কোনো বটতলার নিচে কিংবা চায়ের দোকানের বেঞ্চে সেই কাছারিঘরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, কাছারিঘর ছিল গ্রমীণ সাহিত্য সংস্কৃতির মৌন ইতিহাসকার। এটি আমাদের শেখায়-একসাথে বসে কথা বলা, শোনা, বোঝা আর মানুষ হওয়ার পাঠ। আধুনিকতার ভিড়ে যদি আমরা কাছারিঘরের মানবিক আলো জ্বালিয়ে রাখতে পারি, তবে গ্রামীণ সংস্কৃতির শিকড় কখনো শুকিয়ে যাবে না।

আত্মসমর্পণ

মমতাজ খানম
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

প্রতিটি মানুষের জন্য 'আত্মপরিচয়' এই বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। নিজেকে জানার মাধ্যমে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তখনই জীবন দর্শন নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। 'মুসলিম' আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তায়ালা প্রদত্ত এই গৌরবময় পরিচিতি, মর্যাদা অর্থাৎ 'মুসলমানিত্বের' সঠিক মর্মার্থ বুঝতে পারাটা আমাদের জন্য আবশ্যক।

এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, সত্য দ্বীন ইসলামের অনুসারী অর্থাৎ মুসলিম বলতে আমরা কেবল মুহাম্মদ (স:) এর অনুসারীদেরকে বুঝি। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানা যায় সকল নবী সালাতু ওয়াস সালাম তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছেন।

"আর যদি তোমরা (আমার আহ্বান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও (তাতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না), আমি তো তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছি না, আমার পারিশ্রমিক আছে কেবল আল্লাহর নিকট, আমাকে আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলিম) মধ্যে সামিল হওয়ারই আদেশ দেয়া হয়েছে। [ইউনুস-৭২]

মুসা (আঃ) বলেছিলেন, "হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো, তাহলে তোমরা তারই উপর ভরসা করো। যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।" (ইউনুস-৮৪)

আর এ বিষয়ে ইব্রাহিম (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্রগণকে অন্তিম উপদেশ দান করে গেছে– "হে পুত্রগণ! আল্লাহ এই দিনকে তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন; কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (বাকারা-৫২)

অতঃপর ঈসা (আঃ) যখন তাদের অবিশ্বাস অনুভব করল, তখন বলল, "কেউ আছে কি যে আল্লাহ পথেআমার সহায়ক হবে।" হাওয়ারিগণ বললো, "আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।" (আম্বিয়া-৯২)

এখন আমাদের এটা জানা জরুরি 'মুসলিম' অর্থ কী? কোন কাজের দ্বারা আমি নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করতে পারি?

আমাদের প্রচলিত ধারণা-আমি একটি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার বাবা, দাদা মুসলিম,

তাই আমি মুসলমান। প্রকৃত অর্থে এটাই কি মুসলিম পরিচয়?

মুসলিম অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা প্রদত্ত বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে ধারণ করা ও অনুশীলন করা এটাই একজন মুসলমানের পরিচয়। সে যে পরিবারেই জন্মগ্রহণ করুক, হোক সে নারী অথবা পুরুষ, সাদা অথবা কালো, হোক না যে কোনো জাতির।

মানুষের পারলৌকিক পরিত্রাণ দুই স্তরের কাজের উপর নির্ভর করে। প্রথমটি হল-আকিদা বা আন্তরিক বিশ্বাস, আনুগত্য ও স্বীকৃতি স্তর এবং দ্বিতীয়টি হলো আমল বা কর্ম ও জীবন পদ্ধতির স্তর। মুসলমানদের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভ মানলেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। একজন মুসলমানের সাধারণভাবে যে কোনো মানুষের প্রতি অনেক কোমল আচরণ ও সুন্দর ব্যবহার করতে হবে।

আবু আইয়ুব (রা:) বর্ণনা করেছেন -একদা এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) সফরে যাওয়ার সময় হঠাৎ তার উটের লাগাম ধরে বসলো এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করল-আপনি আমাকে এমন আমল বা কর্ম বলে দিন যেটা করলে আমি দোযখ থেকে পরিত্রাণ পাব এবং জান্নাত লাভ করব।

রাসূল (স:) তাকে বললেন -শোনো তোমার প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিষয়টি অতি বড়।

আমি উত্তর দিচ্ছি; তুমি মনোযোগের সাথে শোনো এবং উপলব্ধি করো–

১। এক আল্লাহর ইবাদত করবে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার ইবাদতের শরিক বা অংশীদার করবে না,
২। নামাজ কায়েম করবে,
৩। যাকাত আদায় করবে,
৪। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের হক রক্ষা করে চলবে।

একজন মুসলিম ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি ভ্রাতৃত্ববোধ, স্বচ্ছতা, সম্প্রীতি, শালীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ করা, সমতা এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা বোধ-এই মূল্যবোধই ধারণ করবেন এবং প্রতিষ্ঠা করবেন। কারণ ইসলাম কোনো ব্যক্তির একক মুক্তিলাভের জন্য আসেনি বরং এটি এমন একটি দর্শন নিয়ে এসেছে যার অনুসারীদেরকে এটাই শেখানো হয় -পৃথিবীটা দুর্নীতিতে পূর্ণ, তুমিই এটিকে পাল্টাতে পারো। আর এর প্রকৃত উদাহরণ হযরত মুহাম্মদ (স:), যিনি আরবের অন্ধকার যুগকে আলোর পথে নিয়ে এসেছিলেন।

"পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন আপনার রব মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।" (সুরা আলাক-১-৫)।

হযরত মুহাম্মদ (স:) এর উপর প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর উনি যখন পাহাড়ে চূড়া থেকে নেমে এলেন, তিনি প্রচণ্ড অসুস্থতা অনুভব করছিলেন, গায়ে জ্বর এসেছিল, তিনি ভয়ে রীতিমতো কাঁপছিলেন। চিরচেনা পৃথিবী তার কাছে অচেনা মনে হচ্ছিল। বাড়ি ফিরে তিনি তার স্ত্রী খাদিজা (রা:) কে সব খুলে

বললেন এবং তখন খাদিজা (রা:) তাকে সাহস, ভরসা দিলেন এই বলে–

আল্লাহর কসম, কখনো না। আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলদের দায়িত্ব বহন করেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন।

সুতরাং একজন মুসলমানের এই মানবিক দিকগুলো অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে। যার দ্বারা তিনি আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলার কাছে পছন্দনীয় ও পুরস্কৃত হবেন।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন-এ আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা বিভিন্ন নবী ও রাসুলদের শিক্ষা দিয়ে অথবা কর্মপন্থা বর্ণনা করে আমাদের নানা ধরনের শিক্ষা প্রদান করেছেন। একজন মুসলিমের প্রতিমুহূর্তের আচার-আচরণ পদ্ধতির স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

কয়েকটি আয়াতের মধ্যে বর্ণিত কিছু শিষ্টাচার আলোকপাত করবো, যে শিষ্টাচারগুলো আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পালন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনের অসংখ্য সূরায়। আল্লাহ সুবহানুওয়াতায়ালা তাঁর ইবাদতের নির্দেশের পর পরই পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার-কে ফরজ করেছেন। তাদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলা বা ধমক দেওয়া এমনকি 'উফ' শব্দটি উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছেন।

সূরা লোকমান-এ 'লোকমান হাকিম' যিনি একজন জ্ঞানী হিসেবে প্রসিদ্ধ, তার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানুওয়া তা'আলা আমাদের অমূল্য শিক্ষা প্রদান করেছেন। প্রত্যেক পিতা-মাতা তার সন্তানের চরিত্র গঠন, পার্থিব এবং মৃত্যু পরবর্তী উভয় জীবনের জন্য তাদেরকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লোকমান হাকিমের এই দশ উপদেশ ব্যক্তিগত জীবনে চর্চা করা আবশ্যক।

১। আল্লাহর সাথে শিরক না করা,
২। পুনরুত্থান ও আল্লাহর বিনিময় দান সম্পর্কে সন্দেহ না করা,
৩। সালাত আদায় করা,
৪। সৎ কাজের আদেশ করা,
৫। অসৎ কাজে নিষেধ করা,
৬। বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা,
৭। অহংকারবশত মানুষকে অবজ্ঞা না করা,
৮। পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা না করা,
৯। পদচারণায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা,
১০। কণ্ঠস্বর নিচু রাখা অর্থাৎ কন্ঠস্বরে ভীতিপ্রদর্শন, অহংকার বা অপমান প্রকাশ না করা (সুরা লোকমান ১৩-১৯)।

সূরা হুজুরাত-এর পুরোটা জুড়েই মুসলমানদের শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে।

১। সম্মানিত ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মুখে কণ্ঠস্বর নিচু রাখা,
২। কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে হলে time maintain করা অর্থাৎ সময় সম্পর্কে বিবেচনা করা,
৩। কাউকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ না করা,
৪। পরস্পরের নিন্দা দোষারোপ না করা,
৫। কাউকে মন্দ নামে না ডাকা,
৬। মন্দ ধারণা থেকে বিরত থাকা,
৭। কারো দোষ অন্বেষণ না করা,
৮। গীবত না করা,
৯। কোনো আবেদনকারী অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী বা ভিক্ষুককে ধমক না দেওয়া।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ বিবিধ বৈচিত্র্য, ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এই শিষ্টাচারগুলো আমরা আমাদের জীবনে অনুশীলন করলে সুষ্ঠু সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এই শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ রসুল (স:)-এর মধ্যে ছিল বিধায় আল্লাহসুবহানুওয়া তায়ালা বলেছেন–

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স:) এর মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে আশা রাখে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে (সূরা আহযাব-২১)।

অন্যত্র বলেছেন-রসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে আসেন তা আঁকড়ে ধরো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক (সূরা হাশর -৭)।

আমরা পরিপূর্ণভাবে রাসূল (স:)-এর মত না হতে পারলেও আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন আমাদের প্রচেষ্টার জন্য। কারণ তিনি আমাদের কোনো কাজের সফলতা বা ব্যর্থতা দেখবেন না, তিনি দেখবেন আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা। এর ভিত্তিতেই তিনি আমাদের পুরস্কৃত করবেন। আর এই কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার পাওয়ার জন্যই ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। কোনো খণ্ডিত চর্চার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। বিষয়টি যদি আমরা 'ইকোসিস্টেমের' সাথে তুলনা করি তাহলে দেখব যে বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি উপাদান যেমন মানুষ, প্রাণী, গাছপালা, মাটি, আলো, পানি, বায়ু এগুলো একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনেকটা বিনিসুতোর মালার মতো। এর একটির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অপরটিও ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আমাদের ব্যক্তি জীবন-পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বোপরি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সাথে সম্পৃক্ত। তাই কোনো একটা জায়গায় যদি সংকট দেখা দেয় তাহলে সর্বত্র সংকট তৈরি হবে। ইসলামের প্রতিটি বিধানকে আল্লাহর সন্তুষ্টি (আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য) অর্জনের জন্য প্রণীত হয়েছে। তাই এর খণ্ডিত বিশ্বাস/চর্চার দ্বারা আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না। প্রতিটি বিধানকে পূর্ণভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। আল্লাহ সুবহানু তায়ালা বলেছেন–

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো আর কিছু অস্বীকার করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে?

আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আজাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন (সূরা বাকারা -৮৫)।

হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু (সূরা বাকারা -২০৮)।

পৃথিবী নামক এই পরীক্ষা কেন্দ্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য চাই আল্লাহ সুবহানুতায়ালার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। কাম, লোভ, মোহ প্রভৃতির দ্বারা বাধাগ্রস্থ হলেও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, কখনো নিরাশ হওয়া চলবে না। সব সময় এটা স্মরণ রাখতে হবে যে–

তিনি রহমান
তিনি কখনো আমাকে নিরাশ করবেন না।
তিনি আমার জন্য উত্তম পরিকল্পনা করবেন।
আমি ভুল করলে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন।
তিনি কখনো আমাকে ছেড়ে যাবেন না।
রহমানের ভালোবাসা সবার উপর বর্ষিত হোক। আমিন।।

উৎস : তারাবির সালাতে কুরআনের বার্তা (শায়খ আহমাদুল্লাহ)
শিকড়ের সন্ধানে (হামিদা মুবাশ্বেরা)
অবাধ্যতার ইতিহাস (ডা: শামসুল আরেফিন)

মানবসভ্যতার বিকাশে ভাষার ভূমিকা

কে এম রব্বানী
অধ্যক্ষ, মোংলা সরকারি কলেজ

১. ভূমিকা

মানবসভ্যতার ইতিহাস ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি মানববুদ্ধি, চিন্তাভাবনা, জ্ঞান, কল্পনা এবং সামাজিক কাঠামোর মূল চালিকাশক্তি। প্রাথমিক মানুষ যখন শিকারী ও সংগ্রাহক সমাজে বাস করত, তখন তারা মৌখিক সংকেত, অঙ্গভঙ্গি এবং সহজ চিহ্নের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করত। সেই যোগাযোগের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বুদ্ধি ও জ্ঞান সঞ্চয় শুরু হয়, যা সভ্যতার ভিত্তি তৈরি করে। একই সাথে সম্মিলিত স্মৃতিভাণ্ডার (কালেকটিভ মেমোরি) তৈরি করেছে।

ভাষা মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর থেকে আলাদা করেছে। বানর বা গরিলার মতো নিকট প্রজাতির তুলনায় মানুষের জটিল চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান, উদ্ভাবন, সামাজিক সম্পর্ক এবং সংস্কৃতির বিকাশের পেছনে ভাষার অবদান অপরিসীম। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার অভিজ্ঞতা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে, যার ফলে প্রজন্মের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হয়েছে এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজের সৃষ্টি হয়েছে।

ভাষা কেবল ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করে না, বরং সমাজের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, আইন, শিক্ষা এবং প্রশাসনকে সুসংহত করে। এটি বুদ্ধি এবং জ্ঞান বিকাশের একটি অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম। মানব চিন্তাশক্তি এবং জ্ঞানের সম্প্রসারণে ভাষা এক অনন্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। প্রাচীন মানব সভ্যতার মৌলিক কাঠামো থেকে শুরু করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক অর্জন পর্যন্ত ভাষার ভূমিকা সবসময় অগ্রণী।

এই প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব–

- সভ্যতার সূচনা ও বিকাশ
- ভাষার উদ্ভব এবং বিবর্তন
- বুদ্ধি ও জ্ঞান বিকাশে ভাষার ভূমিকা
- মানব এবং নিকট প্রজাতির তুলনায় ভাষার গুরুত্ব

- লিখন পদ্ধতি, চিন্তন ধারায় ভাষার প্রভাব
- ভাষার, সমাজ, সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তিতে প্রভাব
- ভাষার সঙ্গে মানব সভ্যতার অটুট সম্পর্কের বিভিন্ন দিক।

২. সভ্যতার সূচনা ও বিকাশ

২.১ প্রাগৈতিহাসিক যুগ

বর্তমান মানব প্রজাতির প্রাগৈতিহাসিক জীবন শুরু হয় প্রায় ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ বছর আগে। এই সময়ের মানুষ প্রথমত সংগ্রাহক এবং পরে শিকারী ও সংগ্রাহক ছিল। তারা প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনযাপন করত; যেখানে খাদ্য, নিরাপত্তা এবং প্রজনন ছিল জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

প্রাথমিক মানুষ মৌখিক সংকেত, অঙ্গভঙ্গি এবং প্রাথমিক চিহ্নের মাধ্যমে যোগাযোগ করত। উদাহরণস্বরূপ, শিকার বা বিপদের সংকেত জানাতে তারা বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করত বা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করত। এখনও অন্যান্য ইতরশ্রেণীর পশু-পাখির আচরণ পর্যবেক্ষণ করলেও এ ধারণার সত্যতা মেলে। এটি খুব সীমিত হলেও কার্যকর একটি যোগাযোগ পদ্ধতি ছিল।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ধীরে ধীরে সামাজিক কাঠামো তৈরি করতে শুরু করে। গোষ্ঠীভিত্তিক জীবন, শিকার ভাগাভাগি এবং বসবাসের জন্য নিরাপদ ও উপযুক্ত স্থান নির্বাচন–এসব কার্যক্রমে প্রাথমিক ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই প্রাথমিক ভাষার মাধ্যমে তারা অভিজ্ঞতা এবং প্রাথমিক জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঞ্চারিত করত।

২.২ প্রাথমিক কৃষিসভ্যতা

প্রায় দশ হাজার বছর আগে মানুষ শিকারীজীবন থেকে কৃষিজীবনে প্রবেশ করে। খাদ্যশস্য চাষ, পশুপালন এবং স্থায়ী বসবাসের প্রয়োজনে বিভিন্ন অভ্যাস ও আচরণের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক কাঠামো আরও জটিল হয়ে ওঠে।

কৃষি সভ্যতায় মানুষকে উৎপাদন পরিকল্পনা, শ্রম ভাগাভাগি এবং সামাজিক নিয়মাবলী শেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে হয়। এই সময়ে ভাষা শুধু যোগাযোগ নয় বরং জ্ঞান সংরক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চার এবং সামাজিক নিয়মাবলী বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, একজন শস্য চাষী তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে শস্যের রোগ, মাটি ও পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অন্যদের শিক্ষা দিতে পারত। এতে নতুন প্রজন্মের জন্য কৃষিজ্ঞান সংরক্ষণ সম্ভব হয়।

২.৩ নগর ও জ্ঞানভিত্তিক সভ্যতা

মানুষের সভ্যতা ক্রমশ জটিল নগর জীবন ও প্রশাসনিক কাঠামোর দিকে এগিয়ে আসে। মেসোপটেমিয়া, প্রাচীন ভারত, মিশর, চীন-সহ অন্যান্য কিছু অঞ্চলে নগর সভ্যতার উদ্ভব ঘটে।

নগর সভ্যতায় ভাষার প্রয়োজন আরও বহুমুখী হয়। প্রশাসনিক কাজ, ধর্মীয় কার্যক্রম, শিক্ষণ ও আইন-সহ প্রয়োজনীয় উন্নত যোগাযোগ এবং তথ্য সংরক্ষণের জন্য লিখন পদ্ধতির উদ্ভব হয়, যা জ্ঞান সংরক্ষণ এবং বর্ণনাকারীর অনুপস্থিতিতেও জ্ঞান বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

লেখা, চিহ্ন এবং প্রতীক ব্যবহার করে মানুষ তাদের অর্জিত জ্ঞান ও তথ্য দীর্ঘকালীন সংরক্ষণ করতে পারত। নগর সমাজে তথ্য আদান-প্রদান, প্রশাসনিক রিপোর্ট, আইন এবং ধর্মীয় নথি সবই ভাষার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়।

৩. ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ

ভাষার উৎপত্তি মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে জটিল ও রহস্যময় দিকগুলোর একটি। ভাষা কেবল শব্দের সংমিশ্রণ নয়, এটি চিন্তাভাবনা, আবেগ, অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক নিয়মাবলী সংরক্ষণের মাধ্যম। বিভিন্ন গবেষণা প্রমাণ করে যে ভাষার বিকাশ মস্তিষ্কের জটিল কাঠামো, সামাজিক প্রয়োজন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

৩.১ মৌখিক ভাষার সূত্রপাত

প্রারম্ভিক মানব সমাজে মৌখিক ভাষা আবিষ্কৃত হয়। প্রাথমিক মানুষ শব্দ, স্বর, টোন এবং অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করত যা মূলত অবচেতন এবং সীমিত পরিসরে। শিকার, বিপদ, আবহাওয়া এবং খাদ্য সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদানে এই মৌখিক সংকেত ব্যবহৃত হত।

ধীরে ধীরে শব্দগুলোর জটিলতা বাড়ে। দলবদ্ধ বসবাসের ফলে কথার আদান-প্রদান বড় আকারে চর্চা ও বিকশিত হতে থাকে। ধারণা করা হয় লিয়েন্ডারথেলদের দল ছোট ছোট হওয়ায় তাদের ভাষার বিকাশ তেমন প্রসারিত হতে পারেনি। এজন্য তারা প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকার দক্ষতা দ্রুতগতিতে বাড়াতে পারেনি বলে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছিল। কথার আদান-প্রদান বড় আকারে চর্চা ও বিকশিত হতে হতে মানুষের মস্তিষ্কের ব্রোকা ও ভার্নিক অঞ্চল (Broca's and Wernicke's areas) দ্রুত বিকশিত হওয়ার কারণে জটিল বাক্য, শব্দবিন্যাস এবং যৌক্তিক সংমিশ্রণ সম্ভব হয়। এ সময় শব্দের অভ্যন্তরীণ অর্থ এবং প্রতীকী চেতনা বিকশিত হতে শুরু করে।

(নোট: মস্তিষ্কের ব্রোকা অঞ্চল কথা তৈরির (Speech Production) জন্য কাজ করে। আমরা কী কথা বলব এবং কীভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করব, তা এই অংশটি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, ভার্নিক অঞ্চল ভাষা বোঝার (Language Comprehension) কাজ করে। অন্য কেউ কী বলছে বা কোনো লেখা পড়ে তার অর্থ বোঝা এই অংশের কাজ।)

৩.২ লিখন পদ্ধতির উদ্ভব

লিখন পদ্ধতি প্রায় ৫,০০০-৬,০০০ বছর আগে উদ্ভাবিত হয়। মেসোপটেমিয়ার কিউনিফর্ম, মিশরের হায়েরোগ্লিফিক এবং প্রাচীন চীনের লিপি এগুলো প্রাথমিক লিখন পদ্ধতি।

লিখন আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল:

- প্রশাসনিক তথ্য সংরক্ষণ
- জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত করা
- আইন ও ধর্মীয় নিয়মাবলী রক্ষা করা

লিখন শুধুমাত্র তথ্য সংরক্ষণে নয়, চিন্তাভাবনার সংহত করতেও বড় ভূমিকা রাখে। একটি লেখা তৈরি করার জন্য প্রয়োজন বিশ্লেষণ, যুক্তি এবং সৃজনশীলতার সমন্বয়। ফলে লেখা তৈরির জন্যও মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তার বিভাগগুলো দ্রুত উন্নত হতে থাকে। মানুষের কল্পনাশক্তি দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। মানুষ লিখিত চিহ্নের সাথে বস্তুর এমন কী বিমূর্ত ধারণার সাথেও মিল (ম্যাপিং) করতে শেখে।

৩.৩ ভাষার বিবর্তন ও বৈচিত্র্য

কোনো অঞ্চলের ভাষা কখনো একরূপে স্থিত ছিল না। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ধরন, শব্দভাণ্ডার এবং ব্যাকরণও পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। ভাষার বিবর্তন দেখায় যে এটি মানব বুদ্ধি, জ্ঞান এবং সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সমন্বিতভাবে বিকশিত হয়েছে।

৪. বুদ্ধি বিকাশে ভাষার ভূমিকা

ভাষা এবং বুদ্ধির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বুদ্ধি মূলত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের ক্ষমতা। ভাষা এই প্রক্রিয়াকে সহজ, কার্যকর এবং বিস্তৃত করে তোলে।

৪.১ চিন্তাধারার গঠন

ভাষা মানুষের চিন্তাধারাকে আকার দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ধারণা বা অভিজ্ঞতার কথা মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রকাশ করার সময় তা সংগঠিত হয় এবং বিশ্লেষণাত্মক রূপ পায়।

ভাষা ছাড়া চিন্তাভাবনা বিচ্ছিন্ন এবং অত্যন্ত সীমিত থাকে। একটি জটিল সমস্যা সমাধান করার সময় মানুষ শব্দ এবং বাক্য ব্যবহার করে চিন্তাভাবনাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটি যৌক্তিকতা এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। লিখিত ভাষায় যা বলা হয়েছে তা পাঠ করে অধিকতর কল্পনাশক্তি মিলিয়ে মানুষ নতুন বুদ্ধি তৈরি করেছে যা চিন্তাধারা বিকাশে ভূমিকা রেখেছে।

৪.২ সমস্যা সমাধান ও যৌক্তিকতা

ভাষার উপস্থিতি মানুষের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ায়। একটি উদাহরণ হতে পারে- শিকার বা খাদ্যসংগ্রহের সময় প্রাথমিক মানুষ কৌশল তৈরি করার জন্য সংকেত এবং শব্দ ব্যবহার করত।

- **তুলনামূলক বিশ্লেষণ :** বিভিন্ন সমাধান বা পরিকল্পনা তুলনা করা সহজ হয়।
- **সৃজনশীল কৌশল :** নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য ভাষা প্রয়োজন।
- **সামাজিক সমন্বয় :** দলের সদস্যদের সঙ্গে সমস্যা সমাধানে মতামত বিনিময়ে ভাষা অপরিহার্য।

৪.৩ স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ

ভাষা মানুষকে স্মৃতি সংরক্ষণ ও প্রজন্মান্তরিত অভিজ্ঞতা প্রেরণ করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, সম্মিলিত অলোচনার সময় প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্মৃতি এবং কল্পনা একত্রিত করে সকলে মিলে একটি সম্মিলিত স্মৃতিভাণ্ডার ব্যবহার করে সমস্যা সমাধানের বহু উপায় থেকে সর্বোত্তম উপায় নির্বাচন করার সক্ষমতা তৈরি হয়। প্রাথমিক মানুষ শিকার, খাদ্য, বিপদ এবং আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা মৌখিকভাবে ভাগ (শেয়ার) করে চলত।

- স্মৃতি চিরস্থায়ী হয় যখন তা লিখন বা ধ্বনি বা চিত্র আকারে সংরক্ষিত হয়।
- প্রজন্মের সাথে অভিজ্ঞতা স্থানান্তরিত হয়, যা ভবিষ্যতের বুদ্ধি বিকাশে সহায়ক।

বুদ্ধি বিকাশে ভাষার এই ভূমিকা প্রমাণ করে যে, ভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান, যৌক্তিকতা এবং স্মৃতির ভিত্তি।

৫. জ্ঞান বিকাশে ভাষার ভূমিকা

ভাষা শুধু বুদ্ধির বিকাশে নয়, বরং মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি, সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণেও অপরিসীম ভূমিকা রাখে। মানুষের জন্য জ্ঞান শুধু অভিজ্ঞতা নয়; এটি সৃজনশীল চিন্তা, বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মূল ভিত্তি।

৫.১ ব্যক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ

ভাষা মানুষের ব্যক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি করে। মানুষ যখন কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতা মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রকাশ করে, তখন তার জ্ঞান গভীর হয়। উদাহরণস্বরূপ:

- কোনো শিকারী শিকার প্রক্রিয়ার কৌশল বিশ্লেষণ করে অন্যের সাথে শেয়ার করলে নতুন ধারণা তৈরি হয়।
- কৃষক তার জমির উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল লিখে রাখলে ভবিষ্যতে তা পুনঃপ্রয়োগ সম্ভব হয়।

ভাষা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা সংরক্ষণকে দীর্ঘমেয়াদি করে। আমরা পরবর্তীতে বিভিন্ন গুহাচিত্রে শিকারের দৃশ্য অঙ্কিত দেখতে পেয়েছি যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দিক নির্দেশক দিল।

৫.২ সামাজিক ও প্রজন্মকালীন জ্ঞান

মানব সমাজের জ্ঞান শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, এটি প্রজন্মান্তরিত এবং সামাজিক জ্ঞান।

- মৌখিক সহভাগ বা শেয়ারিং : গল্প, অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় নীতি এবং নৈতিক শিক্ষা প্রজন্মান্তরিত হয়।
- লিখনভিত্তিক সংরক্ষণ : প্রশাসনিক নথি, ধর্মীয় গ্রন্থ, সাহিত্য-এসব সামাজিক জ্ঞান সংরক্ষণ

করে।

- প্রজন্মকালীন শিক্ষণ: শিক্ষকের ভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের জ্ঞান স্থানান্তরিত হয়।

ভাষা না থাকলে প্রজন্মান্তরিত জ্ঞান সীমিত হতো এবং সভ্যতার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হতো। এমনকি মানুষের এই প্রজাতির বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি ছিল।

৫.৩ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ভাষার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

- **নতুন ধারণা প্রকাশ :** বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সঠিক শব্দ, পদ এবং ব্যাকরণ অপরিহার্য।
- **গবেষণা সম্প্রসারণ :** বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান দ্রুত প্রসারিত হয়।
- **বিশ্বজনীন ভাষা ও সমন্বয় :** বৈজ্ঞানিক ভাষা বিশ্বজনীন ভাষার মাধ্যমে (যেমন ইংরেজি) আন্তর্জাতিক জ্ঞান সম্প্রসারণকে সহজ করেছে।

৬. বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর ভাষার প্রভাব

ভাষা শুধু তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম নয়; এটি মানুষের চিন্তাভাবনা, বিশ্লেষণ, যৌক্তিকতা এবং সৃজনশীলতার মূল ভিত্তি।

৬.১ ভাষা ও সৃজনশীলতা

ভাষা মানুষকে নতুন ধারণা তৈরি ও প্রকাশ করতে সহায়তা করে।

- সাহিত্য, কবিতা, নাটক এবং গল্প-এসব মানুষের আবেগ ও কল্পনাকে ভাষার মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেয়।
- বৈজ্ঞানিক ধারণা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন-এসব ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।
- শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধি মানুষের চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতার প্রসার ঘটায়।

৬.২ ভাষা ও যৌক্তিক চিন্তা

ভাষা মানুষের যৌক্তিক চিন্তাভাবনাকে সংগঠিত করে।

- ধারণা বিন্যাস ও বিশ্লেষণ: একটি জটিল সমস্যা বা ঘটনা ভাষার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা যায়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ: বিভিন্ন বিকল্প বিশ্লেষণ এবং উপসংহার বের করতে ভাষা অপরিহার্য।
- সমস্যা সমাধান: ভাষা চিন্তাকে স্তরায়িত করে এবং যৌক্তিকতা বৃদ্ধি করে।

৬.৩ ভাষা ও আবেগপ্রকাশ

ভাষা মানুষের আবেগ ও মানসিক অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করতে সক্ষম করে।

- **অনুভূতি প্রকাশ :** আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, বিস্ময় ভাষার মাধ্যমে অনেকটা সহজে বোঝানো যায়।
- **সামাজিক সম্পর্ক :** আবেগের বিনিময় মানুষকে সামাজিকভাবে সংহত করে।
- **নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষা :** ভাষা সমাজে নৈতিক শিক্ষা পৌঁছে দেয়।

ভাষার এই তিনটি দিক (সৃজনশীলতা, যৌক্তিক চিন্তা এবং আবেগপ্রকাশ) মানুষকে অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় বিশেষ এবং উচ্চতর করে তুলেছে।

৭. অন্যান্য শ্রেণীর জীবের সাথে মানুষের পার্থক্য

মানবজাতি এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো ভাষা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা। যদিও বানর, গরিলা এবং অন্যান্য নিকট প্রজাতির প্রাণীর মধ্যেও জ্ঞান, আবেগ এবং সীমিত সামাজিক কাঠামো বিদ্যমান, মানুষের ভাষা এই পার্থক্যকে গভীরভাবে প্রমাণ করেছে।

৭.১ মানব বনাম প্রাইমেট

প্রাইমেট বা নিকট প্রজাতির প্রাণী যেমন শিম্পাঞ্জি, গরিলা এবং বানর-তারা মৌলিক সংকেত, অঙ্গভঙ্গি এবং সীমিত শব্দ ব্যবহার করতে পারে। তবে এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

- সংকেত বা শব্দের সংখ্যা সীমিত
- ব্যাকরণের অভাব
- দীর্ঘমেয়াদী অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ কম
- যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও জটিল সমস্যা সমাধান সীমিত

মানবজাতির ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা নেই। মানুষের ভাষা জটিল এবং বিশ্লেষণাত্মক। এটি মানবকে :

- চিন্তাভাবনা আকারে বিন্যস্ত করতে
- অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ ও প্রজন্মান্তরিত করতে
- সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধান সম্ভব করতে সক্ষম করে।

৭.২ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্য

ভাষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্য নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ:

- ধারণা তৈরি ও বিশ্লেষণ: মানুষের জটিল ধারণা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ সম্ভব।
- সমস্যা সমাধান: ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশল, পরিকল্পনা এবং সমাধান বিকাশ করা যায়।
- সৃজনশীল চিন্তা: সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং চিন্তা বিকাশে ভাষাই প্রধান ভূমিকা রাখে।

৮. মানুষের নিকট প্রজাতির তুলনায় ভাষার ভূমিকা

মানুষ এবং তার নিকট প্রজাতির তুলনা ভাষার গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করে।

৮.১ বানর ও গরিলা

বানর, শিম্পাঞ্জি, বেবুন এবং গরিলা-এসব প্রজাতির মধ্যে সীমিত ভাষার ব্যবহার পাওয়া যায়। তবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা জটিল চিন্তা, সমস্যার বিশ্লেষণ এবং সামাজিক কাঠামোতে বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম নয়।

৮.২ নিকট প্রজাতির বুদ্ধি

নিকট প্রজাতির বুদ্ধি মানুষের তুলনায় সীমিত। তারা আবহাওয়া, খাদ্য, বিপদ ইত্যাদি প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, কিন্তু :

- দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং জটিল সমস্যার সমাধান সীমিত
- প্রতীকী চিন্তা এবং বিমূর্ত ধারণা গঠন অপ্রতুল
- অভিজ্ঞতা প্রজন্মান্তরিত করা কঠিন

মানবজাতি, বিপরীতে, ভাষার মাধ্যমে জটিল চিন্তা, যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতা প্রজন্মান্তরিত করতে সক্ষম।

৯. প্রযুক্তি ও ভাষার বর্তমান ব্যবহার

প্রযুক্তি এবং ভাষার সংযোগ আধুনিক সভ্যতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯.১ ডিজিটাল ভাষা

- কম্পিউটার, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ভাষার নতুন রূপ।
- ভাষার মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান দ্রুত এবং কার্যকর।
- ভাষার শুধু কথ্য বা লিখিত রূপ নয়, অডিয়ো-ভিডিয়ো মাধ্যমও ভাষার একটি শক্তিশালী রূপ। আমরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রভাব বিগত প্রায় ১০০ বছর ধরে দেখে আসছি। ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পর অডিয়ো-ভিডিয়ো মাধ্যম অনেক বেশি প্রভাবশালী ভূমিকা রেখে আসছে।

৯.২ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

- ইমেইল, চ্যাট, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ভাষার মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি হয়।
- তথ্য এবং অভিজ্ঞতা দ্রুত প্রসারিত হয়।
- বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাবে অডিয়ো-ভিডিয়ো মাধ্যম ভাষার অন্যতম বাহন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের কাছে সহজগম্য হয়েছে।

৯.৩ ভাষা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

- AI ভাষা মডেল যেমন- ChatGPT, DeepSeek, Gemini ইত্যাদি -ভাষার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য উত্তর প্রদান করে থাকে।
- ভাষা-প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান প্রসারিত হচ্ছে।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনুবাদ মডেল ব্যবহার করে প্রচলিত সকল ভাষাই রপ্ত করে ফেলছে। প্রতিনিয়ত সেলফ-লার্নিং কৌশলে নিজের দক্ষতা উন্নততর করছে।

১০. ভবিষ্যতের সভ্যতার বিকাশে ভাষার সম্ভাব্য প্রভাব

ভবিষ্যতে সভ্যতার উন্নতি এবং মানুষের জীবনধারার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক আরও জটিল এবং কার্যকর হবে। মানুষকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথেও খাপ খাইয়ে চলতে হবে।

১০.১ বৈশ্বিক যোগাযোগ ও ভাষার সম্মিলন

- **ভাষার সম্মিলন :** সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে গিয়েছে, সাথে তাদের ভাষাও সহগামী হয়েছে। ফলে এক ভাষার কিছু কিছু শব্দ অন্য ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। বর্তমান বিশ্বায়নের ফলে ভাষারও বিশ্বায়ন হচ্ছে এবং দ্রুতই একাধিক ভাষার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি দ্রুততর হচ্ছে। তবে শক্তিশালী ভাষা প্রাধান্য পাচ্ছে। কম জনসংখ্যার এবং অনুন্নত সমাজের মানুষের ভাষা বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হবে। ফলে ভাষার সংখ্যা সীমিত হবে বলে অনুমান করা যায়। ইতোমধ্যে বহু ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বহু ভাষা বিলুপ্তির পথে। লিপিহীন ভাষা বিলুপ্তির জন্য সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে পড়েছে।
- **বহুভাষিক সমাজ :** মানুষ একাধিক ভাষায় চিন্তাভাবনা এবং যোগাযোগে পারদর্শী হয়ে উঠছে।
- **সংস্কৃতি ও জ্ঞান সম্প্রসারণ :** বহুভাষিকতা বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রসারকে ত্বরান্বিত করবে।

১০.২ শিক্ষা ও জ্ঞান প্রজন্মান্তরীকরণ

- **ডিজিটাল শিক্ষা :** অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভাষার ব্যবহার শিক্ষাকে বহুমাত্রিক করবে।
- **জ্ঞানের দ্রুত সম্প্রসারণ :** লেখা, কথা এবং অডিয়ো-ভিডিয়োর মাধ্যমে তথ্য দ্রুত প্রজন্মান্তরিত হবে।
- **ভবিষ্যতের চিন্তাভাবনা :** শব্দ এবং ভাষার সমৃদ্ধি মানুষের যৌক্তিকতা, সৃজনশীলতা এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা আরও প্রসারিত করবে।

১০.৩ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

- **নতুন সামাজিক কাঠামো :** ভাষা ভবিষ্যতে সামাজিক সমন্বয়, নৈতিক শিক্ষা এবং মূল্যবোধ প্রজন্মান্তরিত করবে।

- **সংস্কৃতি সংরক্ষণ :** লেখা ও মৌখিক ভাষা ঐতিহ্য, সাহিত্য এবং সৃজনশীলতাকে ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করবে।

১০.৪ প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি

- ভাষার মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহার সহজ এবং কার্যকর হবে।
- বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবন দ্রুত প্রসারিত হবে।
- মানব সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার বহুমাত্রিক এবং বিশ্বজনীন হবে।

১১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ এবং ভাষার সম্ভাব্য প্রভাব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) বিকাশ মানুষের মৌখিক ও লিখিত ভাষাকে নতুন মাত্রা প্রদান করবে।

১১.১ ভাষা ও AI

- **প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (NLP) :** AI মানুষের ভাষা বোঝা, বিশ্লেষণ এবং উত্তর প্রদানে সক্ষম হবে।
- **ভবিষ্যতের শিক্ষণ পদ্ধতি :** AI শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার আরও কার্যকর করবে।
- **যোগাযোগ ও সহযোগিতা :** মানুষ এবং AI-এর মধ্যে ভাষার মাধ্যমে সহজ ও তাত্ত্বিক সমন্বয় সম্ভব হবে।

১১.২ মৌখিক ভাষার সম্ভাব্য প্রভাব

- **বুদ্ধি সম্প্রসারণ :** মানুষের মৌখিক ভাষার মাধ্যমে AI-এর সঙ্গে আলোচনা এবং চিন্তাভাবনা প্রসারিত হবে।
- **সামাজিক যোগাযোগ :** ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও কৃত্রিম সংযোগের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক নতুন মাত্রা পাবে।
- **মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়ন :** ভাষার মাধ্যমে মানব-মন এবং AI-এর সংযোগ নতুন চিন্তাভাবনা সৃষ্টি করবে।

১১.৩ লিখিত ভাষার সম্ভাব্য প্রভাব

- **তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ :** AI মানুষের লিখিত তথ্য বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ সহজ করবে।
- **জ্ঞান সম্প্রসারণ :** বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান দ্রুত প্রসারিত হবে।
- **নতুন সাহিত্য ও প্রকাশনা :** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা লিখনভিত্তিক সৃজনশীলতাকে প্রসারিত করবে।

১১.৪ ভবিষ্যতের সমাজে ভাষার ভূমিকা

- মানব সভ্যতা ও প্রযুক্তির সংমিশ্রণে ভাষা সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের প্রধান চালিকাশক্তি হবে।

- AI-এর মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতা আরও সমৃদ্ধ ও বহুমাত্রিক হবে।

১২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভাষা এবং সভ্যতার সম্ভাব্য সংকট

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) দ্রুত অগ্রগতি মানুষের জীবনে অগণিত সুবিধা আনলেও, এটি কিছু মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং নৈতিক ঝুঁকিও তৈরি করতে পারে। ভাষার মাধ্যমে AI মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারায় এই ঝুঁকিগুলো আরও জটিল।

১২.১ তথ্যের অতিপ্রবাহ ও বিভ্রান্তি

- **ভাষার মাধ্যমে তথ্য প্রসার :** AI মানুষের লিখিত ও মৌখিক ভাষা বিশ্লেষণ করে তথ্য সরবরাহ করে।
- **ঝুঁকি :** ভুল বা পক্ষপাতমূলক তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- **সমাধান :** প্রামাণ্য তথ্য, কন্টেন্ট ফিল্টার এবং মানুষের পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য।

১২.২ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও মানবিক সংযোগের সংকট

- **ভার্চুয়াল সংযোগ :** AI-ভিত্তিক চ্যাট, ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং স্বয়ংক্রিয় কথোপকথন মানুষের প্রাকৃতিক সামাজিক সম্পর্ককে বিকৃত করতে পারে।
- **ঝুঁকি :** মানুষের মৌখিক ও লিখিত ভাষার ব্যবহার সীমিত হয়ে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পেতে পারে।
- **সমাধান :** ভার্চুয়াল ও বাস্তব সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন।

১২.৩ বুদ্ধিবৃত্তিক নির্ভরতা

- **AI-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** মানুষ ক্রমশ AI-এর ওপর নির্ভরশীল হতে পারে।
- **ঝুঁকি :** চিন্তা, বিশ্লেষণ এবং যৌক্তিকতা মানুষের নিজের বিকাশে বাধা দিতে পারে।
- **সমাধান :** AI-কে শিক্ষণ ও সহায়ক হিসাবে ব্যবহার এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনার প্রশিক্ষণ বজায় রাখা।

১২.৪ ভাষার বিকৃত ব্যবহার

- **ভাষার প্রসার ও কৌশলগত ব্যবহার :** AI মানুষের ভাষাকে অনুকরণ করে, তথ্য বিশ্লেষণ করে।
- **ঝুঁকি :** ভুল ব্যাখ্যা, পক্ষপাতমূলক বিশ্লেষণ এবং নৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে। মানব জাতিকে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজ স্বার্থে সৃষ্ট নির্দিষ্ট চিন্তার অনুগামী হতে অবচেতনে বাধ্য হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে।

- **সমাধান :** নৈতিক ও দায়িত্বশীল AI নকশা, ভাষার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১২.৫ সভ্যতায় দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

- **সৃজনশীলতা ও নৈতিক শিক্ষা :** AI-ভিত্তিক ভাষা ব্যবহার মানব সৃজনশীলতা এবং নৈতিক মানদণ্ডকে প্রভাবিত করতে পারে।
- **সংস্কৃতি সংরক্ষণ :** মৌখিক ও লিখিত ভাষার মাধুর্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।
- **সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য :** AI-ভিত্তিক প্রযুক্তির দাপটে সামাজিক বৈষম্য প্রকটভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।
- **মতগঠন :** প্রযুক্তির উপর ক্ষমতাধরদের চিন্তাভাবনা পুরো মানবজাতিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে একদিকে ধাবিত করার ক্ষমতা অর্জন করবে।

১২.৬ ঝুঁকি হ্রাস ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

- **নিয়ন্ত্রণ ও নীতি :** AI-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং নৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন।
- **শিক্ষা ও সচেতনতা :** মানুষের মৌলিক ভাষা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রশিক্ষণ বজায় রাখা।
- **সহযোগী প্রযুক্তি :** AI-কে সহায়ক হিসাবে ব্যবহার এবং মানুষের স্বাধীন বুদ্ধি ও চিন্তার বিকাশ নিশ্চিত করা।

উপসংহার

ভাষা মানবসভ্যতা বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভাষার বিবর্তন শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং বুদ্ধি, জ্ঞান, সামাজিক সম্পর্ক, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যতের সভ্যতার গঠন নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

সর্বোপরি, ভাষা মানুষের সমাজ, চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি, কল্পনাশক্তি, মননশীলতা, সুকুমার বৃত্তি এবং প্রযুক্তির মূল চালিকা শক্তি। ভবিষ্যতে মানবসভ্যতা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ভাষার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা, নীতি এবং নৈতিক মানদণ্ডের সমন্বয় অপরিহার্য। ভাষার সঠিক ব্যবহার সভ্যতার স্থায়িত্ব, জ্ঞানের প্রসার এবং মানবিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১. Noam Chomsky, *Language and Mind*
২. Edward Sapir, *Language: An Introduction to the Studz of Speech*
৩. David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language
৪. wikipedia ও অন্যান্য অনলাইন উৎস

মেঘদূত

ড. অপর্ণা অধিকারী
প্রভাষক, সংস্কৃত বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

মহাকবি কালিদাস– রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা মেঘদূত কাব্য। বিশুদ্ধ বিরহকে অবলম্বন করে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য মেঘদূত। ছন্দে ও শব্দচিত্রে অতুলনীয় এ কাব্য গীতি–কবিতার উদ্যানের শ্রেষ্ঠতম কুসুম। এর প্রতিটি শ্লোক (১১৮ টি) একটি মাত্র ছন্দ মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা। বিরহের বেদনা প্রকাশে এ ছন্দের একটি আলাদা আবেদন আছে আর তাই, বিচ্ছেদের ছবি আর ছন্দের সৌন্দর্য যেন একে অপরের পরিপূরক হয়ে এ কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরবর্তীকালে এ কাব্য জার্মান কবি গ্যেটে, শিলার ও রবীন্দ্রনাথের মতো মহত্তম কবি-প্রতিভাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তারা এই ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বের প্রতি অকুণ্ঠ প্রশংসা বর্ষণ করেছেন সশ্রদ্ধচিত্তে। কবি কালিদাস কল্পনায় মেঘকে এক নির্বাসিত যক্ষের প্রেমাস্পদার প্রতি প্রেম ও অনুরাগের বার্তাবহ দূতে পরিণত করেছেন। আষাঢ়ের ধারা-সম্পাতে নিখিল বিরহী-হৃদয়ের মুখর গীতিকা যেন এখানে সহস্র ধারায় বর্ষিত। বিষয়বস্তু অনুসারে কাব্যটি দু'ভাগে বিভক্ত-পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। পূর্বমেঘে মেঘের যাত্রাপথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং উত্তরমেঘে অলকাপুরী, যক্ষ ও যক্ষপত্নীর বিরহদশা, বিরহিনী যক্ষপত্নীর কাছে যক্ষের বার্তা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। মেঘের যাত্রাপথ বর্ণনায় ভৌগোলিক ভারতের এক রসময় চিত্র উপস্থাপিত করেছেন।

যে বিষয়টি নিয়ে কালিদাস মেঘদূতের অতি রমণীয় শ্লোকাবলী রচনা করেছেন তা খুবই হৃদয়স্পর্শী। যক্ষ ছিলেন কুবেরের উদ্যানরক্ষক। কোনো একদিন যক্ষের অবহেলায় কুবেরের উদ্যান নষ্ট হলো। প্রভু কুবেরের আদেশ পালনে বিমুখ হওয়ায় যক্ষকে অভিশাপ দিলেন-প্রিয়তমা পত্নী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে এক বছরকাল নির্বাসন দণ্ড ভোগ করবে। যক্ষের নিবাস হিমালয়ের কোলে অলকায়। সেখানে আছেন তাঁর পত্নী। আর যক্ষের নির্বাসন হলো অলকা থেকে দূরে দক্ষিণ ভারতে রামগিরি পর্বতে। অভিশাপের আটমাস তাঁর কোনো রকম কেটে গেল। অলকা ও প্রিয়তমা স্ত্রী থেকে বিচ্যুত হয়ে রামগিরির পাদদেশে হৃদয় ক্রমশ ক্ষীণকলেবর হচ্ছিল। তারপর আষাঢ়ের প্রথমদিনে আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখে তাঁর বিরহী আত্মা অসংযত পুরুষের মত কেঁদে উঠল। সে মেঘের মাধ্যমে অলকায় প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে শুভবার্তা পাঠাতে মনস্থির করল। প্রিয়া বিরহে উদ্‌ভ্রান্ত যক্ষ তখন চেতন ও অচেতন পদার্থের জ্ঞান হারিয়ে ঐ মেঘকেই দূত করে পাঠাল অলকায় তাঁর বিরহিনী পত্নীর কাছে। কিন্তু কোথায় সেই অলকা-আর কোথায় বা রামগিরি! কি করে এই দূরের পথ মেঘ ঠিকভাবে চিনে যেতে পারবে-এই চিন্তার উদয়

হলো যক্ষের মনে। মেঘ কোন পথে যাবে, কি দৃশ্য দেখবে যক্ষ তা ইনিয়ে বিনিয়ে মানসচক্ষে মেঘকে দেখাচ্ছে। প্রথমেই নির্দেশ করলেন অলকায় যাওয়ার পথের নিশানা।

যক্ষদূত মেঘ যাত্রা করলেন রামগিরি পর্বত থেকে অলকাভিমুখে। স্নিগ্ধ ছায়াময় এই রামগিরি। বনবাসকালে রাম-সীতা এখানে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। তাই সীতার অবগাহনে এখানকার জল পুতঃপবিত্র। আর রামচন্দ্রের পদচিহ্নে ছবি আঁকা তার কটিদেশ। রামগিরি থেকে মেঘ যাত্রা করল অলকার পথে। সঙ্গী হল গরবী চাতকেরা। আকাশ মার্গে তারা মালার মত দল বেঁধে মেঘের সঙ্গে চলল। রামগিরি থেকে যাত্রা করে সুরভি মালভূমি অতিক্রম করে প্রথমেই মেঘের পথে পড়বে আম্রকূট পর্বত। আম্রকূট পর্বতে রয়েছে প্রচুর আম গাছ। পাকা আমের দ্যুতিতে পরিপূর্ণ সে আম্রবনরাজি। স্নিগ্ধ বেণিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যখন তার উপর গিয়ে বসবে তখন মাঝখানে কালো এবং পার্শ্বদেশ পাণ্ডুবর্ণ, তাই তা পৃথিবীর দর্শনীয় হবে। আম্রকূটের পর মেঘের পথে পড়বে উপলবিষয়ে শোভিত বিন্ধ্যপর্বত। তার পাদমূলে বিশীর্ণা রেবানদী যেন নায়ক বিন্ধ্যের চরণতলে লুটিয়ে আছে। এরপর দশার্ণ প্রদেশ। মেঘের আগমনে কেয়া ফুলের কাঁটা গাছে ঘেরা দশার্ণের উপবনসমূহ হয়ে উঠবে পাণ্ডুবর্ণ আর প্রান্তভাগের জম্বু নিকুঞ্জ ধারণ করবে শ্যামবর্ণ। দশার্ণের রাজধানী বিদিশা। বিলাসিতার সমস্ত প্রকার উপাদানে পূর্ণ এই নগরী। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ঊর্মি চঞ্চল বেত্রাবতী। মেঘ তরঙ্গ-চঞ্চল বেত্রবতীর মধুর জল পান করে যাবে নীচৈ গিরিতে। মেঘের স্পর্শের পুলকে সেখানে ফুটে উঠবে নব কদম্বগুচ্ছ। বিদিশার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে তটিনী নির্বিন্ধ্যা। জলাবর্তরূপ সুগভীর নাভি প্রকটিত করে সে চলেছে এঁকে বেঁকে। যক্ষ মেঘকে প্রলোভন দেখিয়ে একটু ঘুরে যেতে বলেছে উজ্জয়িনী নগরীতে। কারণ উজ্জয়িনীর সৌন্দর্য যদি সে না দেখে তবে অবশ্যই ঠকবে। শ্রীবিশালা উজ্জয়িনী নগরী-সে যেন স্বর্গের লাবণ্য। সেখানে সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদতুল্য সুরম্য সব অট্টালিকা। উজ্জয়িনীর পথে পড়বে নির্বিন্ধা নদী। তরঙ্গচঞ্চল নির্বিন্ধা নদী এমনভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, যেন নায়ক মেঘের জন্য উদ্‌গ্রীব। তারপর ক্ষীণধারা সিন্ধু। বেণীর মতো সরু হয়ে এসেছে যার জলধারা এবং তীরস্থিত ঝরা জীর্ণপত্রে যে পাণ্ডুবর্ণ বিরহদশা প্রাপ্ত সেই সিন্ধু যেন মেঘেরই সৌভাগ্য প্রকাশ করছে।

উজ্জয়িনীতে রয়েছে শিপ্রা নদী। তাতে পদ্ম ফোটে প্রচুর। সেখানে সারস পাখির নিত্য আবাসস্থল। প্রভাত বেলা শিপ্রার সুশীতল বাতাস বয়ে আনে সারসদের মধুর ক'জন এবং পদ্মের সুবাসিত গন্ধ। শিপ্রার শাখা নদী গন্ধবতী। তার তীরে অবস্থিত চণ্ডেশ্বর মহাকাল মন্দির। তার পাশে রয়েছে এক উদ্যান। গন্ধবতীর পদ্মরাগে এবং জলকেলিরতা তরুণীদের দেহগন্ধে সুবাসিত বাতাস এসে সেই উদ্যানকে করে বিকম্পিত। উজ্জয়িনীর পরেই গম্ভীরা নদী। প্রসন্ন চিত্তের মতো নির্মল তার জল। এরপর মেঘ পৌঁছে যাবে দেবগিরিতে। সেখানকার শীতল বাতাস তার সেবা করবে। আর মেঘ দেবগিরিতে অবস্থিত কার্তিকেয়কে পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা স্নান করাবে। দেবগিরির উত্তরে চর্মন্বতী নদী। রাজা রন্তিদেবের গোমেদ যজ্ঞের কীর্তিস্বরূপ এই চর্মন্বতী। তারপর দশপুর, ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, সরস্বতী, কনখল, হিমাচল, কৈলাসধাম ও মানসসরোবর। দশপুরবধূদের চঞ্চল কটাক্ষ সকলের মন ভুলায়। ব্রহ্মার্বত জনপদে কুরুক্ষেত্র ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধচিহ্ন ধারণ করে আছে। কুরুক্ষেত্র ছেড়ে কনখল। সেখানে

শৈলরাজ হিমালয় থেকে অবতীর্ণ হয়েছে জাহ্নবী/গঙ্গা। যক্ষদূত এবার হিমালয়ের ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়ে কৈলাসে যাবে। এই কৈলাসেই অলকা নগরী-মেঘের গন্তব্যস্থল।

যক্ষের অনুরোধমতো মেঘ তার যাত্রা-পথের নগর-নদী-পর্বতের মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে 'কামনার মোক্ষধাম অরকায়' পৌঁছে যক্ষপ্রিয়াকে দেখতে পাবে। অলকা যক্ষদের আবাস-ভূমি। কৈলাস যেন গৌরাঙ্গ সুন্দর এক প্রেমিক- পুরুষ। কোলে নিয়ে বসে আছে অলকা-সুন্দরীকে। অলকার আকাশ-চুম্বী প্রাসাদসমূহে লাবণ্যময়ী ললনারা বিরাজিত, সেখানে প্রণয় কলহ ভিন্ন অন্য কলহ নেই, যৌবন ভিন্ন বয়স নেই, আনন্দাশ্রু ভিন্ন অশ্রুপাত হয় না। অলকার বৃক্ষরাজি সর্বদাই ফুলে ফলে শোভিত এবং মধুলোভী ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত। সেখানে পদ্মসরোবরে নিয়তই পদ্ম ফুটে থাকে এবং হংসশ্রেণী মেঘলা রচনা করে সাঁতার কাটে। অলকায় নিত্য জ্যোৎস্না অন্ধকার নিবারিত হওয়ায় সেখানে প্রদোষকাল অত্যন্ত রমণীয়। এমন মনোরম নৈসর্গিক পরিবেশে যক্ষের বাসগৃহ। ধনপতি কুবেরের সখা মহাদেব স্বয়ং অবস্থান করেন অলকায়। সেখানে এক বৃক্ষ আছে– তার কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়।

যক্ষের অনুরোধে মেঘ 'কামনার মোক্ষধাম অলকায়' পৌঁছে বিরহবিধূরা পতিগতপ্রাণা যক্ষপ্রিয়াকে দেখতে পাবে। অলকার সুন্দরীরা বিধাতার আদি সৃষ্টি তিলোত্তমার ন্যায় অপরূপা সুন্দরী তারা তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা। হাতে লীলাকমল, অলকে নতুন ফোটা কুন্দফুল, মুখে লোধ্রফুলের রেণুতে পাণ্ডুশ্রী, বেণীবন্ধে নতুন কুরবক, কর্ণে সুন্দর শিরীষ ফুল, সীমন্তে বর্ষাজাত কদম্ব ফুল। এভাবে উদ্বেল হৃদয়ে যক্ষ তার প্রিযতমার সৌন্দর্য সম্পদ বর্ণনা করতে করতে তার বিরহবিধূরা প্রিয়তমার অবস্থা বর্ণনা করছে–

সর্বশোভা ও সৌন্দর্যের আধার যে নারী সে যেন আজ শিশিরমথিতা পদ্মিনী। তার প্রিয়তমের বিরহে মলিনবসনা একবেণী ধরা। সহচর তার দূরে, তাই সে চক্রবাক বধূর মতো পড়ে আছে একাকিনী। সে প্রয়োজন বিনা কারুর সাথে কথা বলে না। বিরহের জ্বালা সইতে না পেরে কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টি তার ভারী হয়ে গেছে। বিরহিনীর কোলে রাখা বীণার তারগুলি অশ্রুজলে ভেজা। নিদ্রাহীন দীর্ঘ রজনী যাপনে স্ফীত চক্ষু, মলিন অধরোষ্ঠ। বিরহ-যাতনায় ক্ষীণদেহখানি অতি কষ্টে বার বার শয্যার কোলে রেখে কোনো রকমে জীবনটাকে সে ধরে আছে। যেদিন থেকে প্রিয়তমের সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটেছে সেদিন থেকেই রোজ একটি করে ফুল দেউলির কোণে রেখে দিন গণনায় মগ্ন থাকে-শাপাবসানের আর কত দিন বাকী।

এবার যক্ষ তার বিরহী আত্মার মর্মবেদনা জানিয়ে বার্তা পাঠালো বিরহিণী পত্নীর কাছে– মেঘের মাধ্যমে। যক্ষ মেঘকে বলল, সে যখন তার বার্তা নিয়ে যাবে তার বিরহিণী পত্নীর কাছে তখন সে তা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। কারণ রমণীদের কাছে প্রিয়তমের সংবাদ প্রিয়সমাগমের মতই সুখের ও আনন্দের। যক্ষ তার প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে বলল, বিরহদশায় নিষ্পীড়িত সে রামগিরিতে কোন রকমে জীবনটা ধরে আছে। সে জানতে চায় তার (যক্ষবধূর) কুশল সংবাদ। বিরহ যাতনায় যক্ষের

দেহ ক্ষীণ। উৎকণ্ঠা ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসের উষ্ণ বাষ্পে সে দগ্ধীভূত। যক্ষ জানে, তার প্রিয়তমার অবস্থাও তারই মত। তাই সম তাপময় তনুতে সে মনে মনে মিলনের আকাঙ্ক্ষা করে। বিরহী যক্ষ শ্যামলতায় তার প্রিয়ার দেহ, চকিত হরিণী প্রেক্ষণে তার দৃষ্টি, চন্দ্রে তার মুখশ্রী, ময়ূরের কলাপগুচ্ছে তার কেশদাম আর মৃদু নদীতরঙ্গে তার ভ্রুবিলাস দর্শন করে। কিন্তু তা আংশিক মাত্র। কোনো কিছুতেই তার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য খুঁজে পায় না। নিষ্ঠুর বিধাতা বাম, তাই চিত্রেও সে মিলতে পারেনা তার প্রিয়তমার সাথে। স্বপ্নে দেখা পেয়ে সে ধরতে যায় তাকে। তার এ অবস্থা দেখে বনদেবতারা অশ্রু বিসর্জন করে। ত্রিযামা রাত্রী যক্ষের কাছে এখন দীর্ঘযামা। বিরহ-বেদনার প্রখর উত্তাপে তার হৃদয় নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে।

অনেক চিন্তা করে যক্ষ নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিয়েছে। সে তার বিরহিণী পত্নীকেও কাতর না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। কারণ পরিবর্তনশীল এ জগতে কারুর ভাগ্যে চিরস্থায়ী সুখ বা দুঃখ ঘটে না। ভাগ্যের চাকা একবার উপরে একবার নিচে যায়– "নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ"। আর চার মাস পর বিষ্ণু যেদিন ভুজগ শয়ন থেকে উত্থিত হবেন সেদিনই হবেন তার অভিশাপের অবসান। তাই এই চার মাস চোখ বুঁজে কোনো রকমে কাটিয়ে দিতে হবে। অবশেষে যক্ষ মেঘকে অনুরোধ করছে– বছর শেষে মিলন হবে আশায় সে কোনোমতে প্রাণ ধারণ করে আছে, তার প্রিয়তমাও যেন প্রাণে বেঁচে থাকে- এই সংবাদ প্রিয়তমাকে দেবে। যক্ষ মেঘের মাধ্যমে তাদের এ সব স্মৃতি বলে পাঠাল। তাতে যক্ষপ্রিয় বুঝতে পারবে যে, তার স্বামী কুশলে আছে এবং মেঘ তারই বার্তাবাহক।

স্বল্পপরিসরের কাব্য হয়েও 'মেঘদূত' সংস্কৃত সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। বিচ্ছেদের ছবি আর ছন্দের সৌন্দর্য যেন একে অপরের পরিপূরক হয়ে এই কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশ্বের প্রত্যেক বিরহী চিত্তের করুণ সুর যেন মেঘদূতের প্রতিটি ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই মেঘদূত আজও এর সৌন্দর্যরাশি নিয়ে বিশ্বের প্রত্যেক বিরহীজনের হৃদয় পরিতৃপ্ত করছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে কবি স্বয়ং রিহব্যথাতুর যক্ষ। পত্নীকর্তৃক বিবাহের রাত্রে বিতাড়িত হয়ে নববিবাহিতা কবি নিশ্চয়ই বিরহব্যথায় কাতর হয়েছিলেন। তাই বিরহীর প্রাণের আকুল আর্তি তাঁর কাব্যে এত বাস্তব, এত প্রাণস্পর্শী হয়েছে। পার্থিব বিরহ-বেদনার বিশ্বব্যাপী অলৌকিক অনুভূতির আনন্দই মেঘদূতের সন্দেশ বা বার্তা।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১। মহাকবি কালিদাস প্রণীত মেঘদূতম, কানাই লাল রায়। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
২। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ফয়েজুন্নেচ্ছা বেগম। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৩। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

কবি জয়দেব ও তাঁর গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দম্'

ড. অসিত কুমার বসু

প্রভাষক, সংস্কৃত বিভাগ ও সম্পাদক, মোংলা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদ

জয়দেব-দ্বাদশ শতাব্দীর কবি। তিনি হলেন সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ সার্থক প্রতিভাদীপ্ত রূপকার। জয়দেবের কাছে আমাদের বাংলা সাহিত্যের ঋণের শেষ নেই। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ শিল্পী, আবার তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম আদি পুরুষ। বাংলার প্রাণের সুরটি তিনিই ধরিয়ে দিয়েছিলেন সর্বপ্রথম। শ্রীজয়দেব গোস্বামী পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে জন্মগ্রহন করেন। বর্তমানে গ্রামখানির চলিত নাম কেঁদুলী বা কেন্দুলী। তাঁর পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামাদেবী, পত্নীর নাম পদ্মাবতী। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'ভক্তমাল' থেকে জানা যায় যে, খুব অল্প বয়সেই শ্রীজয়দেব গোস্বামী বৈরাগ্য গ্রহণ করে কেন্দুবিল্ব গ্রাম ত্যাগ করেন এবং পুরীধামে গিয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি বাংলার সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের (আনুমানিক-১১৭৯-১২০৫খ্রী:) সভাকবি ছিলেন। পরে উৎকলরাজের সভাপণ্ডিত হন। কবি জয়দেবের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ'। এই কাব্য রচনায় তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর অবদান সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করেছিলেন। কিংবদন্তী আছে, উড়িষ্যা রাজ্যের পুরীর জগন্নাথধামে যখন জয়দেব এক গাছের তলে বসে ছিলেন তখন এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁর একমাত্র মেয়ে পদ্মাবতীকে জয়দেবের কাছে রেখে যান। জয়দেব বাধ্য হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। ১২২০ খ্রিষ্টাব্দে জয়দেব নিজ গ্রাম কেন্দুবিল্বতেই মারা যান। তাঁর পবিত্র স্মৃতির স্মরণে এবং কবির সম্মানার্থে আজও এখানে প্রতিবছর মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন শ্রীজয়দেব গোস্বামীর মেলা হয়। দূর-দূরান্ত হতে ভক্ত বৈষ্ণব ও বাউলগণ এই মেলায় আসেন। জয়দেবের পুণ্যগাথায় আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়।

সেকশুভোদয়ার কাহিনী অনুসারে জয়দেব ও তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী উভয়ই মার্গসংগীতে পারদর্শী ছিলেন। উড়িষ্যা থেকে লক্ষ্মণসেনের সভায় আগত মহাগায়েন বুঢ়নমিশ্র সংগীতের প্রতিযোগিতায় পদ্মাবতীকে পরাজিত করলেও জয়দেবের কাছে পরাজিত হন। কিংবদন্তী অনুযায়ী এক দক্ষিণা ব্রাহ্মণদম্পতী পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে মানত করে একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। তার নাম রাখা হয় পদ্মাবতী। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতামাতা সুন্দরী কিশোরী কন্যাকে জগন্নাথ মন্দিরে দেবদাসীরূপে দান করেন। পুনরায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁরা কেন্দুবিল্বনিবাসী জয়দেবগোস্বামীর সাথে তার বিবাহ দেন। অপর জনশ্রুতি অনুযায়ী জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাইতেন এবং পদ্মাবতী নাচতেন। বঙ্গদেশে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী ভক্ত কবি জয়দেবের অনুপস্থিতিতে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ 'স্মরগরলখণ্ডনম.....' ইত্যাদি শ্লোকের

পাদপূরণ করেন। অর্থাৎ কালিদাসের ন্যায় তিনিও 'Inspired poet'।

বাঙালি কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' গীতিকাব্যসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সাধারণ দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দ সর্গবন্ধ মহাকাব্য, কাহিনী রাধাকৃষ্ণের প্রণয়। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্যের সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য। কবি স্বয়ং তাঁর কাব্যকে 'প্রবন্ধ', 'পদাবলী', 'মঙ্গল' -' উজ্জ্বগীতি' প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছেন। পশ্চিমী সমালোচকেরা একে বলেছেন 'pastoral drama', Lyric drama', melodrama, opera or 'refined yatra'। সংস্কৃত মহাকাব্যধারার অন্তিম লগ্নে এবং নব্য ভারতীয় সাহিত্যের উদ্ভবকালে এক ভিন্ন পরিমণ্ডলে গীতগোবিন্দ রচিত হয়। তাই আধুনিক সমালোচকেরা একে নাট্যপ্রবন্ধ, গীতিনাট্য, গীতিকাব্য ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন।

'গীতগোবিন্দম্' বারটি সর্গে বিভক্ত। মহাকাব্যের মতো সর্গে বিভক্ত করলেও কাব্যটি খণ্ডকাব্য তথা গীতিকাব্য। এতে চব্বিশটি গান এবং ৩৮৬টি শ্লোক রয়েছে। রাধাকৃষ্ণের শাশ্বত প্রেম এবং বৃন্দবনে কৃষ্ণের বসন্তলীলা এই কাব্যের বিষয়বস্তু হলেও ইহা একখানি আধ্যাত্মিক কাব্য। এতে তাল ও রাগের উল্লেখসহ কতগুলি গীত সন্নিবেশিত হয়েছে। গীতগুলির পূর্বে সংস্কৃত শ্লোক সংযোজিত হয়েছে। রাধার বিরহ, অপর গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের কেলি, রাধার আর্তি, মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও ঈর্ষা, রাধা সখী কর্তৃক অনুরোধ-উপরোধ, কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন, রাধার অনুনয়, পরিশেষে মিলনের আনন্দ। ইহাই এ কাব্যের আখ্যানভাগ। গীতগোবিন্দ কাব্যটি একদিকে প্রেমাশ্রিত গীতিকাব্য, অন্যদিকে ভক্তিমূলক গীতিকাব্যের পর্যায়ে পড়ে। ভক্তিবাদীরা এতে একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য খুঁজে পান। তাঁরা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলনের ইচ্ছা বস্তুত পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একীভূত হবারই রূপক। এই কারণে বৈষ্ণবগণ এই কাব্যটিকে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদায় স্থান দেন।

গীতগোবিন্দম্ মূলতঃ চব্বিশটি গানের পালা। একেকটি শ্লোক হল একেকটি পদ, আর পদের সমষ্টি হল পদাবলী। আটটি পদ নিয়ে এক একটি গান বলে, তাই একে অষ্টপদীও বলা হয়েছে। একেকটি সর্গে এক বা একাধিক গান আছে। প্রত্যেক সর্গের একেকটি বিশেষ নাম আছে, সেই নামটি ঐ সর্গের বিষয়বস্তুর মূল সুরটিকে ধরে দেবার জন্যে ভেবে চিন্তে প্রয়োগ করেছেন কবি। বিষয়বস্তুর দিক বিবেচনা করে কবি প্রতিটি সর্গের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছেন। গীতগোবিন্দমের বারটি সর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো–

প্রথম সর্গ : প্রেমসন্তপ্তা রাধা কৃষ্ণের সন্ধানে নিযুক্তা, প্রিয়সঙ্গের বহুস্মৃতি তার অন্তরে জগরুকা কিন্তু প্রেমিক কৃষ্ণ তখন অন্যান্য ব্রজনারীদের সম্ভোগবিলাসে মাতোয়ারা-তাই তিনি 'সামোদদামোদর'।

দ্বিতীয় সর্গ : সখীদের মুখে অন্য নায়িকাদের প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগের কথা শুনে রাধার হৃদয় ভারাক্রান্ত; তিনি দয়িতের সঙ্গে পূর্ব মিলনের স্মৃতি রোমন্থন করে কাল কাটাচ্ছেন। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে রাধিকাই সর্বাপ্রেক্ষা প্রিয়; সখীদের প্রার্থনা– রাধার দুঃখ দুর্দশা নাশ করে 'অক্লেশ-কেশব' হয়ে কৃষ্ণ আবার ফিরে আসুন।

তৃতীয় সর্গ : উৎকণ্ঠিতা অভিমানিনী নায়িকার চিন্তায় ব্যাকুল কৃষ্ণ মুগ্ধচিত্তে তার কথাই ভাবছেন, তাই নায়ক 'মুগ্ধ-মধুসূদন'।

চতুর্থ সর্গ : রাধার সখীর কাছে প্রিয়বিরহে তার অন্তর্দাহের কথা শুনে কৃষ্ণের অন্তর আত্মতৃপ্তিতে স্নিগ্ধ, তাই নায়ক 'স্নিগ্ধ-মধুসূদন'।

পঞ্চম সর্গ : অনুতপ্ত কৃষ্ণ রাধার সান্নিধ্য লাভের কামনা দূতিকে জানালেন। দূতি রাধাকে অভিসারযোগ্য নীচোল পরে; আলিঙ্গন-রমণ-বিপরীত মিলনের আশায় উদ্বুদ্ধ করলেন। তাই কৃষ্ণ হলেন 'সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীক'।

ষষ্ঠ সর্গ : বিরহিনী রাধা নিজেই নিজেকে কৃষ্ণ ভেবে আত্মানন্দে তন্ময়; সুতরাং সখীর অনুরোধে বিপরীত রতিতে চতুর কৃষ্ণ প্রেমিকার লীলারসে উৎসুক, তাই তিনি 'ধৃত বৈকণ্ঠ'।

সপ্তম সর্গ : প্রিয়তমের আগমন প্রতীক্ষায় উৎসুক রাধা সখীকে একাকিনী ফিরতে দেখে দু:খে ভেঙ্গে পড়েছেন; বসন্ত-রজনীজাগরে অন্যান্য ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে চতুর নায়কের রতিসুখ আস্বাদনের চিত্র কল্পনা করে ঈর্ষাক্ষুব্ধ রাধিকা সখীর কাছে হতাশা ব্যক্ত করলেন; তাই নায়ক হলেন 'নাগর নারায়ণ'।

অষ্টম সর্গ : প্রেম-ব্যবসায়ে দক্ষ বহুবল্লভ কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গে অন্য নায়িকা সম্ভোগের লক্ষণ দেখে মানিনী নায়িকা লজ্জিতা ও ক্ষুব্ধা, তাই এ সর্গের নাম 'বিলক্ষ লক্ষ্মীপতী'।

নবম সর্গ : অভিমানিনী রাধা কৃষ্ণকে প্রত্যাখান করলেও অন্তরে আকুল হয়ে উঠলেন; সখীরা তাকে ভৎর্সনা ও উপহাস করলেন। অবশেষে দূতী কৃষ্ণের কাছে রাধার প্রেম ও অনুতাপ নিবেদন করলেন; তাই কৃষ্ণ তখন 'মুগ্ধ মুকুন্দ'।

দশম সর্গ : বিনোদিনী রাধার মানভঞ্জনে নিযুক্ত হলেন কৃষ্ণ; অনুতপ্তা রাধা তখন বিহ্বল, নায়কও মুগ্ধ; তাই এ সর্গের নাম 'মুগ্ধ মাধব'।

একাদশ সর্গ: কৃষ্ণের মিনতিতে রাধা মান-অভিমান বিস্মৃত হলেন; সখীদের আশ্বাসে মিলন-পিয়াসী রাধা কুঞ্জগৃহে এলেন; নায়ক কৃষ্ণ তখন আনন্দে অধীর; তাই এই সর্গের নাম 'সানন্দ গোবিন্দ'।

দ্বাদশ সর্গ : নায়ক-নায়িকার সানন্দ মিলন ঘটল; পরস্পরের আলিঙ্গনে দুটি তনু এক হল; তাই অন্তিম সর্গ 'সুপ্রীত পীতম্বর'।

গীতগোবিন্দের আলোচনায় কাব্যের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত-লৌকিক প্রণয়কাব্যের পরিমণ্ডল, অলৌকিক ভাগবত প্রেমের তত্ত্ব এবং নাট্যগান। সংস্কৃতসাহিত্যে প্রণয়কবিতার ক্ষেত্রে কালিদাস থেকে যে ধারার সূচনা, মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য, প্রকীর্ণ-কবিতা প্রভৃতি সর্বত্রই শৃঙ্গার বর্ণনার যে রীতি দেব-দেবীদের লীলাবিহার বর্ণনাতেও যে আঙ্গিক ও উপাদান- জয়দেব গীতগোবিন্দের নায়ক-

নায়িকা কৃষ্ণ-রাধার চটুল প্রণয়ের চিত্রে সেই ভাব ও আঙ্গিক নির্দ্ধিধায় গ্রহণ করেছেন। উমাপতিধর, শরণ, গোবর্ধন আচার্য, ধোয়ী প্রভৃতি কবিরা হলেন তাঁর সমসাময়িক। উক্ত কবিদের রচিত কাব্য অথবা মুক্তক শ্লোকগুলি (দুচারটি ছাড়া) সবই প্রণয় কবিতা। ধোয়ীর পবনদূত, গোবর্ধনের আর্যসপ্তশতী কিংবা কোশকাব্যে সংকলিত সে যুগের শৃঙ্গারসর্বস্ব অন্যান্য শ্লোক এবং গীতগোবিন্দের ন্যায় প্রণয়কাব্য ও কবিতার স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে তৎকালীন বাংলার রাজকীয় এবং সামাজিক পরিমণ্ডলটিকে বুঝতে হবে। পুরাণপ্রসিদ্ধ গোপীকৃষ্ণ-প্রেমলীলার পাশাপাশি আদিরসাশ্রয়ী-লৌকিক প্রেমের ধারাটি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল; জয়দেব প্রধানত: তাকে অবলম্বন করেই কাব্য লিখেছিলেন। প্রেমের আর্তী, মিলনের আকুলতা, বিরহের দৈন্য, বিপরীত রতির চটুল ও স্থূল চিত্র এবং সম্ভোগের সরস বর্ণনা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই জয়দেব পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবিদের নিকট ঋণী। জয়দেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের পূর্বসূরী-এই মত বিচারসাপেক্ষ; অনেকের অনুমান ধর্মমতে তিনি ছিলেন পঞ্চোপাসক স্মার্ত। গীতগোবিন্দকে লৌকিক প্রেমের আবরণে শুদ্ধ দিব্য প্রেমের রসময় পরিবেশন বললে তা যে একদেশদর্শী আলোচনা সেকথা বলাই বাহুল্য। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় এবং রাজকীয় উচ্চবিত্ত সমাজজীবনে আদিরসের বাহুল্য থাকায় সেই যুগমানসের উপযোগী করেই এরূপ কাব্য রচনা করা হয়েছিল।

জয়দেবের বহু পূর্বেই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাংলাদেশেও আধ্যাত্ম-তত্ত্বাশ্রয়ী ধর্ম-ভাবনাকেন্দ্রিক গোপী-কৃষ্ণ প্রণয়কাহিনী সার্বজনীনভাবে সমাজের সর্বস্তরে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। পণ্ডিতদের অনুমান খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক অথবা তার কিছু পূর্ব থেকেই মহাভারতপ্রসিদ্ধ মহাত্মা কৃষ্ণ অপেক্ষা গোপবালক কৃষ্ণের নি:সার প্রভৃতি তালে নিবদ্ধ। বর্ণনা প্রধান শ্লোকগুলি প্রধানতঃ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে (শার্দূলবিক্রীড়িত সর্বাপেক্ষা অধিক) রচিত। সংগীতবিদ্‌দের মতে এ গুলিকে ‘প্রবন্ধগান’ (‘ছায়ালগ’ বা ‘সালগসুভ’ শ্রেণিরপ্রবন্ধ) বলা চলে। ভারতীয় চিত্রকলায় রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীকে (বিশেষত: গীতগোবিন্দকে) অনুসরণ করে একটি বিশেষ শিল্পধারা প্রবর্তিত হয়, এর নাম কাঙ্গড়া চিত্রকলা।

গীতগোবিন্দের অনুকরণে পরবর্তীকালে কতিপয় গীতিকাব্য রচিত হয়েছিল এবং এ সব রচনার পশ্চাতে ধর্মীয় অনুপ্রেরণাই ছিল প্রধান। গীতগোবিন্দানুসারী কাব্যগুলি হল-বংশমুনির গীতদিগম্বর, ভাণুদত্তের গীতগৌরীপতি, সোমনাথের কৃষ্ণগীত, হরিশঙ্কর, প্রভাকর ও রামকবির গীতরাঘব নামক তিনটি পৃথক কাব্য, রামের গীতগিরিশ, তিরুমলরাজের গীতগৌরী। গীতগৌরীপতি হুবহু জয়দেবের কাব্যের অনুকরণে রচিত। গীতগোবিন্দে যে যাত্রাগান বা নাট্য-গীতের পূর্ণরূপ পাওয়া যায়, তার আদি এবং অন্তরূপ আমাদের কাছে লুপ্ত হলেও এরূপ যাত্রাগান ধর্মীয় উৎসবে– অনুষ্ঠানে ও পালাপার্বনে গাওয়া হত, তার প্রমাণ পাই বৃহদ্ধর্ম পুরাণের-কাহিনীতে।

সাহিত্য, সংগীত ও ভক্তিরসের মর্যাদায় গীতগোবিন্দ অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। কৃষ্ণ, রাধা ও তার সখী গোপিকাদের কথোপকথন, প্রেমিক-প্রেমিকার নানান অবস্থা ও ভাব এবং প্রকৃতি বর্ণনার আঙ্গিকে কাব্যটি রচিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দে প্রণয়ের উপাদান, আঙ্গিক চরিত্রচিত্রণ, ভাবপ্রবাহ সর্বত্রই লৌকিক প্রেমকবিতার বাতাবরণ, ক্বচিৎ ভক্তিরসের ক্ষীণ সুরের রেশটুকু ধ্বনিত। কাব্যের প্রস্তাবনায় কবি তাঁর কাব্যে লৌকিক ও ভগবদ্ভক্তির বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

বাংলা ভাষা যখন সাহিত্যে ভাব-বহনোপযোগী হয়ে অন্যতম আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সে সময়ে (দ্বাদশ শতকে) বাঙালি কবি জয়দেব সংস্কৃতে কাব্যচর্চা করেছেন। তিনি সংস্কৃত আর বাংলার মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে এনে সহজবোধ্য করে তুলেছেন। 'কোমলকান্তমধুর পদাবলী' রচনা করে তিনি পাঠককে নন্দিত করেছেন। এই গীতিকাব্যের আধ্যাত্মিক আবেদন ছাড়াও কাব্য শিল্পের আবেদনও কম নয়। শুধু বিষয়ে নয়, রচনার মাধুর্যের জন্যেও জয়দেবের রচনা আদরণীয়। বহু প্রাচ্য পণ্ডিত গীতগোবিন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ভাবগাম্ভীর্যে. পদলালিত্যে, ছন্দোমাধুর্যে এবং শাশ্বত সৌন্দর্যের চিত্রকল্পে জয়দেব সত্যই এক মৃত্যুঞ্জয় কবি। বাংলাসাহিত্যের ছন্দের যাদুকরি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়–

"বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্তকোমলপদে।
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে।"

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ড, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
২। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, জাহ্নবী ভৌমিক
৩। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়,নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য।
৪। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, গৌরীনাথ শাস্ত্রী। কলিকাতা।
৫। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার রায়, কলিকাতা।

নজরুল-সাহিত্যে দেশপ্রেমের স্বরূপ অন্বেষণ

প্রদীপ অধিকারী
প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। জন্ম অবিভক্ত ভারতবর্ষে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের আসানসোলের জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে। ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর স্কুলের ছাত্র হিসেবে কৈশোরে স্বল্পকালীন অবস্থান এবং অতিথি অভ্যাগতরূপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, সিলেটে কাটানোর কথা ছেড়ে দিলে তাঁর সমস্ত সক্রিয় জীবন কেটেছে পশ্চিমবঙ্গে। ২৪শে মে ১৯৭২ খ্রি. নজরুলকে যখন ঢাকায় আনা হয় তখন তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে বাক ও চলৎশক্তিরহিত অবস্থায় ছিলেন।

নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর সাহিত্যকর্মের অন্যতম প্রধান বিষয় দেশপ্রেম ও মানবতাবাদ। কবি নজরুল এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেন যখন দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারে বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছিলেন। দেশবাসীর চেতনায় তখন দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা ইত্যাদি ভাব ছিলো জাগ্রত। সে সব ভাবই নজরুলের কবিতায় ভাষা পেয়েছে। অগ্নিবীণা, বিষেরবাঁশী, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা, প্রলয়শিখা ইত্যাদি কাব্য তাঁর দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের সৃজনশীল সময়ের অনেকটাই ব্যয় করেছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে, সভা-সমিতি ও রাজনীতি করে। ১৯১৯ সালে "ব্যাথার দান" গল্পে যে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছিল তার জন্য কলকাতার একটি প্রেস গল্পটি ছাপতে রাজি হয়নি। শুধু দেশপ্রেম নয়, নজরুলের এই গল্পের আন্তর্জাতিকতা বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি নতুন দিক বলতে হবে। গল্পের দুই প্রধান চরিত্র যোগ দিয়েছিল "লাল ফৌজে"। এ লাল ফৌজ মূলতঃ রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবকে বাচাঁনোর জন্য রুশদেশের ভিতরে মজুর শ্রেণির পার্টি ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেতৃত্বে জনগণ যে সৈন্যদল গঠন করেছিল তার নাম। সেইসময় ব্রিটিশ ভারতের সরকার চারদিক থেকে আটঘাট বেঁধে ফেলেছিল যে, কোনোক্রমেই অক্টোবর বিপ্লবের ছোঁয়া ভারতে প্রবেশ করতে না পারে। তাই কমরেড মোজাফফর আহম্মেদ গল্পটি প্রকাশ করার সময় "লাল ফৌজ" কেটে "মুক্তি সেনার দল" বসিয়ে দিয়েছিলেন।

নজরুল যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন। তাঁর বাসনা ছিল এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবেন। তিনি লেখন,

"এ দেশ ছাড়বি কিনা বল,
নইলে কিলের চোটে
হাড় করিব জল"।

কমরেড মোজাফফর আহম্মেদের মতে, নজরুলই প্রথম ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানান। চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে নজরুলের পরিচয় ছিল। কংগ্রেস থেকে উদ্ভূত "লেবার স্বরাজ পার্টির" সদস্য ছিলেন নজরুল। পরে কমরেড মোজাফফর আহম্মেদের সান্নিধ্যে পৌঁছে সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যদিও পার্টির সদস্য ছিলেন না।

নজরুলের দেশপ্রেমের স্বরূপ অন্বেষণের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, "নজরুলের সাহিত্যে যে দেশপ্রেমের বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা যৌবনের আবেগে উন্মোথিত, পৌরুষদীপ্ত এবং জ্বালাময়ী।" অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে দেশ স্বাধীন হবে গান্ধির এই আশ্বাসে কবি খদ্দর পরেছেন। সুতাকাটার চরকার গান গেয়েছেন। কিন্তু গোরখপুরের চৌচারিয়ায় পুলিশ গুলি চালালে আন্দোলনরত জনতা সহিংস হয়ে ওঠে। গান্ধি সংগে সংগে আন্দোলনের ইতি টানেন। একটুখানি সহিংসতায় গান্ধি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কবি হতাশ হয়ে লেখেন,

"মাদিগুলোর আদি দোষ
ঐ অহিংস-বোল নাকি নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর্ মা বিনাশ
নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি"।

চরকা কাটার ধীর গতির ফলে আন্দোলনের উপর থেকে তাঁর মোহ ঘুচে যায়।

"সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই,
বসে বসে কাল গুনি, জাগোরে জোয়ান
বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি"।

নজরুল বুঝেছেন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অহিংসা দিয়ে কোনো কাজ হবে না। অহিংস আন্দোলনের ব্যর্থ প্রয়াসকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে বলেন,

"ধর্ম-কথা, প্রেমের বাণী, জানি মহান উচ্চ খুব
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙ্গে মন্ত্র ঝাড়ে সে বেকুব"

বর্তমান জাতিসংঘের তখন নাম ছিল "লীগ অব নেশন"। এই "লীগ অব নেশন"এর কপটচারিতা নিয়ে রচিত নজরুলের রসাল কবিতা "লীগ অব নেশন"। এতে সিংহ, হাতি, বাঘ, ভালুক, নেকড়ে প্রভৃতির প্রতীকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালী, আমেরিকা, জার্মানিকে বোঝান হয়েছে। ডোমিনিয়ন স্টাটাস, রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রভৃতি ঘটনা নিয়ে রচিত কবিতাগুলো তৎকালীন রাজনৈতিক চতুরালির চিত্র বহন করে। নজরুল লেখেন,

"রাজা শুধু রাজাই রবেন, পগারপারে নির্বাসন
রাজ্য নেবে দু'ভাই মিলে, দুর্যোধন আর দুঃশাসন
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রবে সিংহাসনে নামমাত্র"।

তরুণদের তিনি আহবান জানালেন সশস্ত্র সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিতে। "ওরে তরুণের দল, তোদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে বলতে পারে, যতক্ষণ আমার প্রাণে ক্ষীণ রক্তধারা বয়ে যাবে ততক্ষণ আমি তা দেশের জন্য পাত করবো"। ধূমকেতু পত্রিকায় ১৯২২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত "আনন্দময়ীর আগমনে" লেখার জন্য কারারুদ্ধ হন নজরুল। তিনি লেখেন,

"দুর্বলেরে বলি দিয়ে
ভীরুর এ হীন-শক্তিপূজা দূর করে দে
বল মা ছেলের রক্ত মাগে দশভূজা"।

দেশোদ্রোহের অভিযোগে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কবি শুরু করলেন জবানবন্দি, যেন অগ্নিবীণাতে উঠেছে সুর, "আমার উপর অভিযোগ আমি রাজবিদ্রোহী, আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচার দগ্ধ করবে"। বিচারে নজরুলের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হলো। কারাগারে অনশনে তাঁর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে উঠলো। তাঁর মুক্তির দাবিতে কলকাতায় জনসভা হলো। সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কবি মুক্তি পেলেন। এই কারাভোগে এই অনশনে দেশের আপামর তরুণ তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলো। কবি বললেন, "জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমার অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাংলাদেশ দিয়েছিল ফুলের শৃঙ্খল। ভালোবাসার চন্দন"। তিনি দেশব্যাপী ভ্রমণ করে শোষণহীন শ্রেণিহীন স্বাধীন স্বদেশ গড়ার প্রত্যয়ে উচ্চারণ করলেন, "আট বছর ধরে বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় প্রতি মহকুমায় ছোট বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশেকে ভালোবাসলাম। মনে হলো এই আমার মা। তার শ্যামস্নিগ্ধ মমতায়, তার গভীর স্নেহরসে তার উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা নীলে আমার দেহ-মন-প্রাণ আনন্দ ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে উঠলো।

চট্টগ্রামে বিপ্লবী সূর্যসেন, অনন্ত সিংহ এরা নজরুলের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। নোয়াখালীতে নজরুলকে সংবর্ধনা দিয়েছেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিপ্লবী বীর লোকনাথ বল ও তার সহযোগীরা। নজরুল হয়ে উঠলেন স্বদেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গের প্রেরণা। একদিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি, নজরুল গেছেন কবি সুফিয়া কামালের বাড়িতে। বসেছে গানের আসর। একজন ব্রিটিশের গোয়েন্দা ছিলেন সেই আসরে। নজরুল সংগে সংগে কবিতা আওড়ালেন,

"তুমি টিকটিকি,
জানি ঠিক ঠিকই"।

ব্যঙ্গ কবিতা শুনে গোয়েন্দাটি রাগ করে উঠে যেতেই কিশোরী সুফিয়া কামাল বললেন, "দাদু তুমি ওকে চিনলে কী করে?" নজরুলের উত্তর– গায়ের গন্ধে। ও যে বড় কুটুম।

দেশদ্রোহীতার অভিযোগে প্রথম নিষিদ্ধ বইয়ের নাম "যুগবাণী"। প্রাণাধিক পুত্র বুলবুল মারা গেছেন। কবির চোখে জল, কিন্তু দেশপ্রেমের ফুলকি ছড়িয়ে পড়লো "প্রলয় শিখার" প্রতিটি শব্দে। বাজেয়াপ্ত হলো "প্রলয় শিখা"। তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে "চন্দ্রবিন্দু" কাব্যে লিখলেন,

"কাফ্রি চেহারা ইংরিজি দাঁত,
টাই বাঁধে পিছে কাছাতে
ভীষণ বাম্বু চাষ করে ওরা
অস্ত্র আইন বাচাঁতে"।

নিষিদ্ধ হলো "চন্দ্রবিন্দু"। ১৯২৯ সালে নজরুল ভাষণ দেন, "ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে যাত্রা শুরু হয়নি, শুধু আয়োজনেরই ঘটা হোচ্ছে– তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। নজরুল এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়কে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের কল্যাণের স্বার্থে এক হতে বলেছেন। তিনি লেখেন,

"ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা
ওরে ও হিন্দু মুসলেমিন।
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না,
সুযোগ পালালে মেলা কঠিন"।

নজরুল আরও বলেন,

"খালেদ আবার ধরিয়াছে অসি, অর্জুন ছোড়ে বাণ
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান"।

যে বিষের বাঁশি নজরুল বাজিয়েছেন, যে ভাঙ্গার গান তিনি গেয়েছেন তার মূলে ছিল দেশপ্রেম। "ভাঙ্গার গান" কবিতাতেও দেশপ্রেমের এক বিপ্লবাত্মক ধ্বণি উচ্চারিত হয়েছে।

"কারার ঐ লৌহ কপাট / ভেঙ্গে ফেল কর্‌রে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণবেদী / লাথি মার ভাঙ্গ রে তালা
যত সব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি"।

নজরুল ইসলাম বাঙালি মুসলমানের ভেতর দেশপ্রেম, স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করার জন্য ইসলামী ঐতিহ্য ও বীরত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা তার কাব্যে তুলে ধরেছেন। "কামাল পাশা" কবিতার মাধ্যমে তুর্কী বীর কামালের বীরত্ব, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চেতনাকে দেশবাসীর মনে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। নজরুল স্বদেশের জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের শহিদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

" দেশ বাচাঁতে আপনারি জান শেষ করেছে / বেশ করেছে।
শহিদ ওরাই শহিদ / বীরের মত প্রাণ দিয়েছে
খুন ওদেরই লোহিত / শহিদ ওরাই শহিদ।"

মুসলমানদের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার জন্য "মোহররম" কবিতায় বলেছেন,

"ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা–
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া-ক্রন্দন চাহি না!
জাগো ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাঁক।
শহিদের দিলে সব লালে-লাল হয়ে যাক!"

দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে কবি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে ধ্বংসযজ্ঞের আহবান জানিয়েছিলেন সেই ধ্বংসের পিছনে সুন্দর একটি দেশ গড়ার স্বপ্ন ছিলো। এজন্য তিনি "প্রলয় উল্লাস" কবিতায় বলেছেন,

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর-প্রলয় নূতন সৃজন বেদন!

আসছে নবীন-জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর"।

স্বদেশকে নিয়ে নজরুলের অহংকার আকাশছোঁয়া। তাঁর দাবী–

"এই দেশেরই আচার দেখে / সভ্য হলো নিখিল ভূবণ / দিব্য পরিপাটি"।

নজরুলের স্বদেশ সভ্যতা সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বের অন্য সব দেশের শিক্ষাদাত্রী। মূলতঃ নজরুল ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই তিনি বিদ্রোহী হয়েছিলেন। "বল বীর, বল উন্নত মম শির, শির নেহারী আমারি নত শির / ওই শিখর হিমাদ্রীর।" তাঁর এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য স্বাধীনতার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

"মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত / আমি সেই দিন হবো শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল, আকাশে বাতাসে ধ্বণিবে না
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না,
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত, আমি সেই দিন হবো শান্ত"!

সত্য সত্যই তিনি শান্ত হয়ে গেলেন। নজরুলের দেশপ্রেমের তেজ সৃষ্টিকর্তার অসহ্য হলো। রবি অস্তাচলে যাবার পরের বছরই ব্রিটিশ সিংহ যাকে দমাতে পারেনি, সেই কবি বিরল স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হলেন। চির নির্বাক হয়ে রইলেন বাকী চৌত্রিশ বছর। দেশ প্রেমিকের দেশ স্বাধীন হলো, ইংরেজ শাসনের অবসান হলো, স্বাধীন বাংলাদেশ হলো কোনো কিছুই কবিকে স্পর্শ করলো না। শুধু অসহায় চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা।

আজ আমাদের বড় দরকার ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান দেশপ্রেমিক, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা আমাদের জাতীয় কবিকে। যিনি ইসলামী কাওয়ালির সাথে গেয়ে উঠবেন শ্যামা সংগীত। যিনি চিৎকার করে বলবেন,

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
হে কাণ্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার"।

যিনি পুত্রের নাম রাখবেন কৃষ্ণ-মোহাম্মদ। যিনি রেল লাইনে পড়ে থাকা শ্রমিকের মৃতদেহ দেখে চিৎকার করে বলে উঠবেন,

"যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবুসাব এসে চড়িল তাহাতে কুলিরা পড়িল তলে"।

আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলবেন,

"আসিতেছে শুভদিন
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা
শুধিতে হইবে ঋণ"।

তথ্য ঋণ : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত–নজরুল সমীক্ষণ

আবুবকর সিদ্দিকের কথা সাহিত্যে ব্রাত্যজন ও ব্রাত্যভাষা

মনোজকান্তি বিশ্বাস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

দীর্ঘ সময় পরিক্রমণান্তে প্রায় অর্ধশতাধিক গুণগত গ্রন্থসম্ভারের তুলিহীন সাহিত্য শিল্পী আবুবকর সিদ্দিক। তিনি বাংলা সাহিত্যে অনন্য হয়ে আছেন কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, জীবনী, প্রবন্ধ সাহিত্য ওগণসংগীতসৃষ্টিরজন্য।(১৯৩৪-২০২৩খ্রি.)প্রায় সত্তর বছরের সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে শ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যভুবনে তাঁর অতলান্তিক সমৃদ্ধি। ১৯৩৪ সালের ১৯ আগস্ট বাগেরহাট জেলার গোটাপাড়া গ্রামে মাতুলালয় জন্মগ্রহণ করলেও তার পৈতৃক নিবাস ছিল বাগেরহাট জেলার বৈটপুর গ্রামে।

প্রসঙ্গতঃ ব্রাত্যজন বলতে বোঝায় সেই সব মানুষ বা সম্প্রদায় যারা শাস্ত্রীয় বা সামাজিক নিয়ম কানুন (ব্রত/সংস্কার) থেকে বিচ্যুত, ব্রতভঙ্গকারী, পতিত, বা মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী; মূল অর্থ : ব্রত (প্রতিজ্ঞা/সংস্কার) থেকে ভ্রষ্ট (বিচ্যুত)।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে : সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রান্তিক বা Excluded জনগোষ্ঠী, যারা সাধারণ নিয়ম বা আচার-অনুষ্ঠান পালন করে না। সুতরাং, ব্রাত্যজন মানে হচ্ছে এমন মানুষ যারা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি বা ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে সরে গেছে বা ছেদ পড়েছে। আবুবকর সিদ্দিকের সাহিত্যসমুদ্রে তাদেরকে খুঁজে বের করার প্রয়াসে এই প্রবন্ধ।

কথাসাহিত্যের অনন্য রূপকার আবুবকর সিদ্দিক তাঁর নিরীক্ষার শেকড় প্রোথিত করেছেন প্রধানত দলিত ব্রাত্যজন ও ব্রাত্যভাষাকে আশ্রয় করে। ব্রাত্যজনের ভাষায় সমৃদ্ধ ভিন্নতর প্রকাশ আবুবকর সিদ্দিকের গল্প ও উপন্যাস তথা তার ব্যতিক্রম কথা সাহিত্যে।

বরেণ্য ঔপন্যাসিক হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দিতে তার 'জলরাক্ষস' ও 'খরাদাহ' উপন্যাসই যথেষ্ট। এছাড়া 'বারুদপোড়া প্রহর' ও 'একাত্তরের হৃদয়ভস্ম' সেই স্বীকৃতিকে আরও সুদৃঢ় বন্ধনে গ্রথিত করেছে। প্রথমে তার উপন্যাস এবং পরে গল্পের মধ্যে প্রবন্ধে-শিরোনামের সত্যতা অনুসন্ধান করা যাক।

এবার উপন্যাসের দিকে নজর দেয়া যাক। জলরাক্ষস আবুবকর সিদ্দিকের প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসে প্রকৃতি, ব্রাত্যজন ও পীড়িত সমাজব্যবস্থার সকরুণ অবস্থানকে নিয়ে এসেছেন একই সমতলে। এদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগময় অবস্থায় মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। স্বজনহারা, আশ্রয়হীনতা, মহামারির পেছনে প্রকৃতির নির্মম আচরণের সাথে সুবিধাবাদী স্বার্থান্ধ মানুষের স্বার্থপরতার যুগপৎ অভিযান ফুটে উঠেছে। রিলিফ পাচার থেকে শুরু করে অসহায় নারীকে প্রলোভনের জালে ফেলে সম্ভোগ করা তাদের নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। রাক্ষুসে জল, ঝড় ও ভয়ংকর অসাধু মানুষের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিরীহ মানুষের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় জলরাক্ষস উপন্যাসে। এ উপন্যাসে ব্রাত্যজন ও ব্রাত্যভাষার এক অনন্য দলিল উপস্থাপন করেছেন সমাজ সচেতন লেখক আবুবকর সিদ্দিক।

আদিম শক্তির উৎস হিসেবে অরণ্য বারবার উঠে এসেছে সাহিত্যে, একই সাথে ফুটে উঠেছে জীবন চর্চার ব্যবচ্ছেদ। জীবনসত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবেলায় মানুষের বাঁচার লড়াইকে ধ্রুপদ সাহিত্যের জীবনবোধের রূপায়ণ নিরীক্ষা করেছেন।

বাংলাদেশের দক্ষিণের জেলা তথা লেখকের নিজ জেলা বাগেরহাট এর দক্ষিণের আশপাশের জলাভূমি, সুন্দরবন তথা জল জঙ্গলের মানুষের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে অনবদ্য এ 'জলরাক্ষস' উপন্যাস। এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনদৃশ্যপটকে গোনজোরালি, জরিন, ইদু মুনশি, ছবরোদ্দি, আয়নাসুন্দরী, চৌধুরী, ঘেঁড়েল, মেয়েলোক সবাই কল্পিত চরিত্র হলেও এদের মাধ্যমে তুলে ধরে ত্র অঞ্চলের ব্রাত্যজনদের তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন জঙ্গলের ডাকাত, বাঘ, কুমিরসহ বন্যপ্রাণীদের সহাবস্থানের মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন কাহিনী। সমাজ জীবনের বহুবিধ বৈষম্যের শিকারে পরিণত মানুষের সমস্যাবলী শনাক্ত করে 'জলরাক্ষস' উপন্যাসকে সমাজের উচ্চমঞ্চে স্থান করে দিয়েছেন।

লেখকের ভাষায়, "মানুষের এখন মার খাওয়ার কথা। পিঠ পেতে মার খায়। প্রকৃতির মার আর মানুষের মার। এইভাবে এই পালা-খতম হবে। পাল্টা মার দেবার সময় আসবে তারপর। তখন পিঠ ঘুরিয়ে বুক নিয়ে দাঁড়ানো লাগবে ঠিক।"

এ উপন্যাসে লেখকের ব্রাত্য ভাবনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গোনজোরালি ও তার পরিবার। গোনজোরালিকে লেঠেল বানিয়ে চৌধুরী টাকার পাহাড় বানিয়েছে অথচ তার বিপদে চৌধুরি সাড়া দেয়নি, অবজ্ঞায় দূরে

ঠেলে দিয়েছে। গোনজোরালি ক্ষোভে দুঃখে চৌধুরির মাথা চিবোয়, 'পোকা খাওয়া দাত। চাপা খেদে মাড়িতে ঘষা খায়। জাঁতায় জাতা পেষার শব্দ। দুই জাতার ফাঁকে চৌধুরীর খুলি চোয়াল গ্রীবার হাড় চরম পেষাইয়ে গুঁড়ো হয়ে যেতে থাকে।' এ সমাজের গোনজোরালিরা এভাবে মার খায়, কখনো বা বাঁচার জন্য উঠে দাঁড়ায়। এভাবেই তাদের জীবনচক্র চলে আসছে।

জরিন নিঃসন্তান রমণী-গোনজোরালির স্ত্রী। স্বামী তার শখ-আহ্লাদ কিছুই পূরণ করতে পারেনি। জন্ম নাড়ি কাটিয়ে কিছু টাকা পেয়েছে। তবু জরিনের মা হওয়ার সাধ জাগে। তাই কুড়িয়ে পাওয়া এক ছেলেকে দেখে, "মা ডাক টাটিয়ে ওঠে স্তনের তলায়।" ছেলেটির ভেদবমি শুরু হলে জরিন ওষুধের সন্ধান করে; কিন্তু টাকা কোথায়? টাকা নেই,আছে একমাত্র সম্বল শরীর। ভূঁড়েলে রিলিফ অফিসার লোভ দেখায়, শরীরের বিনিময়ও জরিন প্রতারিত হয়। ওষুধ পায় না। ক্রোধে ফেটে পড়ে। চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দেয়। টাকা ও পাপকে পুড়িয়ে মারে। অবশেষে গোনজোরালি ও সম্পত্তির হাঁড়ি নিজের দখলে আনে। স্বপ্নের ঘোরে সে স্ত্রীকে বলে, "ভাবিসটা কী? ধোনে সব হয়। ঘর বানবো। নিকে করবো। ছোয়াক বানাবো। তোর কোল ভরে দেবো।" তারা পালাতে চেয়েও পালাতে পারে না।

ব্রাত্যজনের সংগ্রামী মানসিকতার চিত্র আরও প্রখর হয়ে ধরা দিয়েছে উপন্যাসের শেষাংশে এসে।

সাড়ে পাঁচ হাত উঁচু ঢেউ ঘিরে আসে দিগন্ত জোড়া। তাদের মাথায় সাদা ফেনার পাড়। গোনজোরালির দুই বাইসেপ ফুলে ওঠে। পেশিগুলো কামড়ের চোটে ফেটে যেতে চায়। বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় হাঁপানী। বিশাল তুফানের বেগ এসে পড়ার আগে এ কী কানফাটানো গর্জন! বুকে বৈঠা চেপে কাঁপতে থাকে সে। জলের দিকে চেয়ে চোখ রাঙায়, কী, মার খাবি? মাইর!

পালটা, মাথা ভাঙতে ভাঙতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেউয়ের মার। জরিন চ্যাঁচাতে থাকে, ওরে আল্লাগ আল্লা! এ কই যান? যাই? যাই আরেক চরে। নয়তো কোন গঞ্জে। বাঁচতি হবে না? অতঃপর–

বেপাত্তা বাচ্চার লাশ আঁকড়ানো জরিন শোলার মতো উড়ে যায় শূন্যে। আগ্রাসী তুফান জিভের ডগায় ধরে নেয়। সাদা শুঁড় ডগার উপর তুলে নেয় লিকলিকে কালো ডিঙিটাকে। তার গোড়ায় উড়ন্ত গোন-জোরালি।

নায়ক-নায়িকার মৃত্যু হওয়ায় ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক বলে মনে হতে পারে; কিন্তু অনুধাবন করলে দেখা যাবে, এই নেতির মাঝেই ইতির ইঙ্গিত– মৃত্যুর মাঝেই লুকিয়ে আছে উজ্জীবনের দীপ্তি। এক গোনজোরালির পতন হলেও সে গোটা প্রতিবাদী মানবজাতির প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। 'জীবন আপাতত অদৃশ্য' হলেও একদিন ওরা জেগে উঠবে– 'তিনভাগ গোঁ গোঁ জলের বেয়াদবিতে একভাগ ধুক ধুক মাটি তলিয়ে যায় কখনো। কখনো বা ভেসে ওঠে।'

অপ্রধান চরিত্রচিত্রণ, পরিবেশ পরিকল্পনা ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও লেখকের কৃতিত্ব চোখে পড়ে। এমনি কিছু খণ্ডচিত্র :

১. মড়াটাকে সবাই মিলে নদীতে ভাসাবার তাল করছে। আর কী করার? আয়নাসুন্দরী ফ্যাড়াৎ করে

পরনকাপড় ছিঁড়ে খুলে ফ্যালে। হিস্টিরিয়ার বাই ওঠা রুগীর মতো চ্যাঁচায়, এই ন্যাও কাফন। পতিধোন গো তুমি কাফন নি পরে যাও।

২. টুকটুকে ফর্শা চাষীবউ নৌকোর গুরোতে পেট বাধিয়ে উবু হয়ে ঝুলছে। ঝুলছে নয়, দু'হাতে সামনের গুরোর কাঠ চেপে ধরে, দু'পায়ে খোলে ঠ্যাকনা বাধিয়ে নিরুপায় বেপরোয়া মেয়েটা মানুষ বিয়োচ্ছে।

৩. বাইরে ঝুপঝাপ পাড় ধসার শব্দ। লাশ নিয়ে ক্ষুধার্ত শেয়ালেকুকুরে কাড়াকাড়ি। পুবঘেঁষা বাতাসের ঘষা খেয়ে দুমড়ে; আমুচড়ে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসে ফুলে ওঠে পাশের নদী। ছোবল মেরে তুলে নিয়েছিল কোনো এক ঝুপড়ির পেছন দিক। মাচাসুদ্ধ দুধের বাচ্চা জলের খাবলে তলিয়ে গ্যাছে। নয়তো ভেসে গ্যাছে। ফলে আধাপ্রহরের যৌথ উত্তেজনা। ঘাটে ঘাটে ফ্যালা, ডুবোডুবি। বাপটা বুক চাপড়ায়। মায়ে সুর তোলে মড়াকান্নায়। না খেয়ে শুকনো নাঈয়ের গোড়া দিয়ে পেঁচিয়ে ওঠা যে কান্না, বেশিক্ষণ তার ধার টিকে থাকার কথা নয়। স্বরটুকু মরে গিয়ে এখন টনটনে শিসের ফলা কুঁইয়ে কুঁইয়ে লক্ষ্যবিন্দু হয়ে ফিরছে অন্ধকারের নোংরায়।

জীবনকে দেখা ও দেখানোর ক্ষেত্রে আবুবকর সিদ্দিক যুক্তিনিষ্ঠ, উদার মানবতাবাদী এবং প্রাণশক্তির অধিকারী এক বলিষ্ঠ লেখক। তিনি শোষণ ও নির্যাতনের অবসান চেয়েছেন, স্বার্থান্বেষী মহলের মুখোশ উন্মোচন করেছেন, গণমানুষের আর্থসামাজিক মুক্তি চেয়েছেন। তাঁর এ-চাওয়া গতানুগতিকভাবে নয়, সাদামাটাভাবেও নয়। এ-চাওয়ার মাঝে আছে লেখকের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিল্পবোধ। আপাত মনে হতে পারে, এ-উপন্যাসে আদিরসের প্রাধান্য বেশি। আসলে চরিত্র ও পরিস্থিতির অনিবার্য কারণেই কোথাও কোথাও আদিরস স্থান পেয়েছে– লেখক অহেতুক পাঠককে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্যে তা করেননি।

যেমন, এক জায়গায় সন্তানহীন জরিনের মাতৃহৃদয়ের তীব্রতা প্রকাশ করেছেন এভাবে, 'তার স্তনজোড়া কাঁচা দুধে ফুলে বিশাল ভারী। ব্যথায় টাটান দিচ্ছে। বুকের উপর বোবা ছেলেটা উবুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার মুখের মধ্যে বারবার বোঁটা ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু সে মুখ সে দেহ সবি পাথরের। ভেতরে থুথু নেই রস নেই শ্বাস নেই। ঠাণ্ডা কঠিন পাথর বেয়ে গরম দুধ গড়িয়ে পড়ে। আর জরিনের বুকের দম বন্ধ হয়ে আসে পাথরের ভারে। বাতাস। বাতাস তুমি কোথায়?'

খরাদাহ উপন্যাসের বিষয় দুর্ভিক্ষ ও পটভূমি উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চল, যাকে স্থানীয় কথ্য বাংলায় বলে 'বরীন'। বাংলা সাহিত্যে দুর্ভিক্ষ নিয়ে উপন্যাস যথেষ্ট লেখা হয়েছে। আবার উত্তরবঙ্গের পটভূমি নিয়ে রচিত উপন্যাসেরও অভাব নেই। তাছাড়া, খরাদাহর ব্রাত্য চরিত্রগুলোর দোসরও বাংলা উপন্যাসে অপ্রতুল নয়। মানিক, তারাশঙ্কর থেকে শুরু করে সমরেশ, সতীনাথ, কমল কুমার, অমিয়ভূষণ, দেবেশ রায় পর্যন্ত অনেক মুণির নাম এই মুহূর্তে স্মৃতির তালিকায় চলে আসে, এমনকি এঁদের একাধিক উপন্যাস খরাদাহর তুলনায় উৎকৃষ্টতর তথা বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী শিল্পকর্ম। একজন নিয়মিত পাঠকের এই অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অনস্বীকার্য কথাটি হলো, খরাদাহ বাংলা কথাসহিত্যে এক সম্পূর্ণ

ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। আবুবকর সিদ্দিক শুরুতেই খরায় পোড়া বিরান পটভূমি ও তার কুক্ষিগত কয়েকটি পুত্তলিবৎ সামান্য মানবপ্রাণীর অসহায় এক পীড়িত ছবি এঁকে কাহিনির একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন। নিচে পোড়া প্রান্তর, মাথার ওপর আকাশ জোড়া গলন্ত রোদ আর সমস্ত চরাচর জুড়ে মাঝে মাঝেই দমকে দমকে ফোস্কা পড়ানো লু হাওয়া। এই বিভীষিকার ফ্রেমে বন্দি একদল খরাযাত্রী। তারা ধুঁকে ধুঁকে চলেছে হয়তো কোনো এক উত্তরণের লক্ষ্যে। আবুবকর সিদ্দিকের কলমের দক্ষতায় এই বর্ণনাটুকু, শুধু এই বর্ণনাটুকুই বা বলি কেন, গ্রন্থের আদ্যন্ত বর্ণনাই ক্ল্যাসিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এও অন্যদের রচনাশৈলীতে অপ্রচলিত নয়। আশ্চর্যজনক ব্যতিক্রম ধরা পড়ে অন্য ক্ষেত্রে এবং সেই ক্ষেত্রটি হচ্ছে ঔপন্যাসিকের কল্পনাশক্তির অভিনবত্ব ও তার প্রকাশের উপযোগী ভাষার স্পর্ধিত নতুনত্ব। একজন প্রগতিশীল মানবতাবাদী কথাশিল্পীর পক্ষে ওপরে বর্ণিত সূচনাপর্বের (খরাযাত্রী) চরিত্রগুলোকে নিশ্চয় খুৎপীড়িত ও শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে আঁকবার লোভ সংবরণ করতে না-পারারই কথা। আবুবকর সিদ্দিকও সে-পথ ধরেছেন। তবে তাঁর কল্পনার সম্পূর্ণ অভিনবত্ব এই, তাঁর চরিত্রগুলো অন্যান্য প্রচলিত উপন্যাসের মতো প্রথাসিদ্ধ আচরণের অনুকারী নয়। এরা আসলে একটি বরযাত্রী-পার্টি। একদিকে দয়াহীন প্রকৃতির বীভৎস আক্রমণ, অন্যদিকে ঢোলডগর, সানাই, কাঁসর সহযোগে বিয়েপার্টির মাতলামো ও খেউড়। কাহারদের নাভিশ্বাস ও বিয়ের গান। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসজুড়ে এই আশ্চর্য কন্ট্রাস্টের শিল্পচাতুর্য। তীক্ষ্ণ সিরিয়াসনেসের সঙ্গে খুব সূক্ষ্ম কৌশলে স্যাটায়ার ও হিউমার মিশিয়ে রূঢ় বাস্তবের ভয়াবহতাকে ক্রমাগত প্রকট করে তোলা হয়েছে। পাঠক কখনো আতঙ্কে শিউরে ওঠেন, কখনো বিজাতীয় বমিবোধে আর্ত হন, যখন দেখেন, সমূহমৃত্যুর দাঁতের ওপর দাঁড়িয়ে চরিত্রগুলো অবলীলায় অশ্লীল ফিচলেমিতে মত্ত।

শুধু যে যান্ত্রিকতামুক্ত তা নয়, খরাদাহ উপন্যাসের আদ্যোপান্ত নিষ্ঠুর নিসর্গ ও জীবনপদ্ধতির ক্ষমাহীন বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কী অসাধারণ সব মানবরসে আর্দ্র নম্র চিত্র চকিতে পাঠকের সংবেদনাকে নাড়া দিয়ে যায়। মানুষের প্রতি অপরিসীম মমতাই একজন লেখকের রচনায় এমন হিউম্যান কোয়ালিটি সঞ্চারিত করতে পারে। বিয়ের আসরে ঘুমিয়েপড়া কাজী সাহেবের তড়াক করে লাফিয়ে ওঠা এবং মেশিনের মতো কলেমা পড়াতে শুরু করা, জ্যোৎস্নারাতে বিয়েবাড়ির কোলাহল থেকে সরে আসা সংচরিত্র নাটু ঘটকের নিরালায় বসে করুণ কণ্ঠে মালসী গীত গাওয়া, বিয়েবাড়ির ভোজনপর্ব চলাকালে জোতদারের লাঠিয়াল বাহিনীর লাঠির চাপে হুমড়ি খেয়ে ক্ষুধার্ত মানুষের ঢল ঠেকিয়ে রাখার দৃশ্য, বাসরঘরে বরকে নিয়ে অশীতিপরা নানীবুড়ির হাস্যমশকরা, বিয়ের ভোজনের পাশাপাশি এক ভিখারির-ভাতের পাগলের– টিনের থালায় নাঙা হাড় গড়িয়ে যাওয়ার অতিপ্রাকৃত গড়গড় শব্দ ও সেইসঙ্গে ভিখারির কণ্ঠের আর্তনাদ: 'অয় মাতারীগে একমুট ভাদ দে। জানট্যা নাইখ!' একেবারে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা।

মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে রাতারাতি ভিটেমাটি বিকিয়ে দিয়ে ভোরবেলায় সেই বিকোনো ভিটের ওপর বসে সপরিবারে পোলাও খেতে উদ্যত কিসমতের পাতের সামনে নয়া মালিক মসিদ খাঁর লেঠেলের আবির্ভাব, ভিটেমাটি থেকে উৎখাত কিসমত পরিবারের অনিশ্চিত যাত্রাপথে সহসা বিয়েবঞ্চিত বেকার

রমাপদ ঢ্যানার দাঁতাল হাসি, পালকির মধ্যে নববধূ চিকনদাসীর প্রতি মাতৃস্নেহবঞ্চিত নপুংসক বর দলিলের মাতৃভক্তি ও কামপ্রবৃত্তিতাড়িত এক দ্বন্দ্ব জটিল বিচিত্র আচরণ, খোলা মাঠে বৃষ্টির জন্যে নামাজরত অবস্থায় খরায় ও অনাহারে মুমূর্ষু বৃদ্ধের চোখের মণিতে চিলের ঠোকরানি, খরাদগ্ধ নিরাশ্রয় প্রান্তরের মধ্যে জামাই দলিলকে প্রসবোন্মুখ তরুদাসীর 'ব্যাটা' বলে সম্বোধন ও সেই অপত্য ডাকের অভিঘাতে ছন্নছাড়া দলিলেরও ওই মাকে বাঁচানোর জন্যে উন্মাদের মতো দৌড়াদৌড়ি– নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের এসব খণ্ড দৃশ্য এই বইয়ের অমূল্য যত মানবরস-জারিত সম্পদ। বিশেষ করে, কবরে এক পা দেওয়া নানীবুড়ির অদম্য জীবনপিপাসার চিত্রগুলো বাংলা কথাসাহিত্যের অমর শিল্পকর্ম। নানীবুড়ি বাসরঘরে নতুন বরের কান মলে দিয়ে ছড়া কাটে :

'হেই গ জামাই তুমহাল মুকে পাদি।
হামি না তোর কেনা বাঁদী।
হাঁচি হামি মেইয়ার নানী।
হনু তুমহাল লতুন রাণী।'

উপন্যাসে লেখক প্রতিটি আচরণের মধ্য দিয়ে নানীবুড়িকে একেবারে জলজ্যান্ত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছেন।

সূর্যোদয়ের আগেই নতুন মালিক মসিদ খাঁর ম্যানেজারকে ভিটেমাটির মালিকানা সঁপে দিয়ে উন্মূল কিসমতকে সপরিবারে পথে নামতে হয়। তবু সে অন্তিম বিদায়পর্ব কিছুটা বিলম্বিত হয়ে যায় নানীবুড়ির পোলাও খাওয়ার তাড়নায়! 'নানীবুড়ি কোনো দিকে না তাকিয়ে হাপুর হুপুর সেই পোলাও গিলে চলেছে। কী তার তাড়া আর তাড়না! যেন যম এসে পাতের সামনে থানা পেতে খাড়া। বুড়ির বাঁ হাত উঁচুতে তুলে ধরা। বুঝি শমনকে ঠ্যাকা দিয়ে রেখেছে সেই হাত দিয়ে।'

উপর তেলচিটে গামছা খাটো লুংগি বেঁটে মানুষটি। চোখ কচলে টালুমালু করে তাকায়।' সামান্য কয়েকটি কথায় কেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে এই গুরুত্বহীন একটি চরিত্র। তারপর বিয়ে পড়ানোর সময় এহেন নগণ্য মৌলবীর 'কাঁপা কাঁপা সুরেলা গলায় কী সে গৎবাঁধা তথী!'

আর মৌলবির শাসনাধীন দুলামিয়া দলিলের সেয়ানা আচরণটিও কৌতুকের উত্তেজক, সন্দেহ নেই; 'ভালোমানুষ দলিল মাছখাওয়া বেড়ালের মতো পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে দুবলা দাড়ির নাচন দ্যাখে। চোখের ভাষা বলে, কী বালের তামিল দেচে র‍্যা! বিহ্যাতে বইসত্যে বইসত্যেউ দশলাইনের পাটটো হামার মুখস্থ। অর আগে হামিই বাতে্ল্য দিত্যাছি।' বাংলা সাহিত্যে বিয়েবাড়ির এমন বিচিত্রসব বর্ণনা অপূর্ব। তেমনি মসিদ খাঁর কাছারিঘরে অপেক্ষমাণ নরোত্তম কবিরাজের আশ্চর্য ছবিটি : 'খাটের উপর বসে ঘামে সেদ্ধ হয়ে ঝিমুচ্ছিলো সাতাশ/আটাশ বছর বয়েসের শাদা শলা শলা চুল ও খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা এক কবিরাজ। তার পরনে ময়লা ধুতি পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো। গায়ে জামাগেন্জিহীন একটা ঢলঢলে রংজ্বলা কালো কোট। কতো কাল খেতে পায় না যেন?

যেন গর্তে সেঁধানো চোখ। সে চোখে আলো নেই। সে তো চোখ দিয়ে দ্যাখে না। নাড়ি টিপে দ্যাখে। তার নাম নরোত্তম কবিরাজ। খাঁ সাহেবের 'কল' পেয়ে রাত একপহর থাকতে ম্যালা করেছে। পাঁচগাঁয়ের ধুলো ঠেঙিয়ে ভোরবেলা এসে বসে রয়েছে।'

শুধু অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ নয়, লেখকের সংবেদনশীল বর্ণনার গুণে এই গ্রন্থের জীবজন্তুগুলোও একেবারে মানবিক অস্তিত্ব নিয়ে বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ফলে উপন্যাসের তুঙ্গ মুহূর্তে মসিদ খাঁর পোষা সোয়াশো মোষ আড়াইশো কিষানের নিয়ন্ত্রণে একটি পরিপূর্ণ গণবিপ্লবের শরিক হয়ে ওঠে আর বিশেষ করে কালবাউশ নামের মোষটি, সেও যেন এই বিপ্লবেরই এক অগ্রনায়ক চরিত্র। তেমনি বাস্তুহারা কিসমতদের কুকুর গদাও এই কাহিনির এক অবিচ্ছেদ্য চরিত্র।

দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রাম থেকে উপবাসী মেয়েদের কিনে নিয়ে যায় শহরের পাইকারি নারীব্যবসায়ী। ভীতচকিত মেয়েরা পথ চলতে পিছিয়ে বা এলোমেলো হয়ে পড়লে তাদের খাসিবকরির মতো তাড়িয়ে নিয়ে চলে দালাল। উপন্যাসে চিত্রটি বড় মর্মস্পর্শী ভাষায় অঙ্কিত হয়েছে : 'কসাই যেমন গোরু ঠাহর করে, তরুকে দেখে তেমনি দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা। ওদিকে মেয়েরা দলছুট। ঝট করে কিসমতকে বলে, ট্যাকা লিব্যেন জী? লগদালগদি। বহু তুমহার সতীলারী হয়, শহরে যায়্যা ভি ট্যাকা এম ও করবে। কিসমত হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। আশকারা মনে করে লোকটা দুকদম এগিয়ে আসে। হঠাৎ করে ফড়িয়া-পাইকের ভাষা চালাতে থাকে, ফের ই আকালটে কাটল্যে পর ঘরের বিবি ঘরকে ফিরব্যেক। অখন তুমহি ছ্যালাপোল্যা সামহাল দাও। খাও পরো। মনে ল্যায় মাগী একটো মাঙনা লিয়্যা ল্যাও ভাগাড় ঘাঁট্য। দিনাদুয়েকের মামলা বটে।'

দালালটি দলের মেয়েদের তাড়া করে এই ভাষায় : 'আ যাযা! মাগীগুলান ধায় কি বা! বুকপাটায় হেম্মত হয়্যাছে লয়? আরে হে-ই হ্যাট্ হ্যাট্!'

বিষয় ও ভাষা এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গিয়েছে যে, বর্ণনাগুলো মুহূর্তের মধ্যে সপ্রাণ হয়ে ওঠে। মসিদ খাঁর লম্পট বংশধর আরশাদকে হত্যা করার ব্যাপারে প্রৌঢ় কিষাণ সুবিদ দ্বিধা প্রকাশ করতে লাগলে ভল্লা তাকে তার নিজের মতো একধরনের ভুয়োদর্শী ভাষায় একটা অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে বুঝ দেয়– 'বিষের পরে মায়া? কহ। বিষের শ্যাষ দে লিক্যাশ। কুরানে কহে কী না? কহ।'

এরকম আরো একটি মজার উল্লেখ পাই পথচলতি নানীবুড়ির প্রস্রাবরত দৃশ্য দেখে মেয়ে তরুদাসী যখন তিরস্কার করে ওঠে : 'আ মরণ! বুড়িট্যা দেঁড়িয়ে মোতে। শরিয়ত মানে না!'

আরেকটি জায়গায় শুধু সংলাপের মধ্য দিয়ে খরার পুরো ভয়াবহতা অত্যন্ত রোমাঞ্চকরভাবে ফুটে উঠেছে– 'হোই শেতলমামা গ, একফোট্ মুত্ আলচে না যি! কুণ্ঠে গেলচে শালো মুত্ আঁ! পালাইচে কুণ্ঠে আঁই? শীতল পর পর দুটো কোঁৎ দিয়ে তারপর কথা বলে, খরার দ্যাশে সবটুক খার্যা লিলচ্ র্যো। নবী আঁৎকে উঠে প্রশ্ন করে, শরপেৎ খালাম যি? উ শরপেতও খায়্যা লিল্চে আরো বেগ দিস দিকিস্। ত্যাখন অক্তর ফোট ঝুরব্যে। চায়্যা দেখিস্ তু চান্দের আলায়।'

নাটুঘটক যখন ষাঁড়-লড়াইয়ের মেলায় গিয়ে মসিদ খাঁর কাছে মেয়েমানুষের বর্ণনা দেয়, শুধু সংলাপের জাদুতে সেই শব্দগুলো একটি উদম্যযৌবনা নারীদেহকে মূর্তিমতী করে তোলে : 'আল্লাজী লিজ হাতে বানায়্যাছেন। কামিখ্যার সতীলারী। চউখে ঠাটাঝিল্কি– ঠোঁট দেখ্যা দাঁত কালকুট্টি হয়। উয়ার জোড়াবুকে পাথর চাপল্যা ভি ধসে না বস্যে না। আর হায় পাছা দেখলা পর্যাণ ভি পাছাড় খায়!'

চামচামার্কা বিচিত্র চরিত্র নাটু মিয়া রাতের বেলা মোষের ডাক শুনে চিঁচিঁ করে বলে, 'শালী গরম হলচে। অখন গাভিন হবেক।'

বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় খানাপিনার আসরে একটা মজার ব্যাপার চালু আছে। পরিবেশনকারী যখন মাংস বিলি করতে শুরু করে, ঠিক সেই মুহূর্তে বাবুর্চি সাহেব আবির্ভূত হন এবং সহাস্য বিনয়ে নিজের রন্ধননৈপুণ্যের প্রশংসাটি আদায় করে নেন উপস্থিত ভোজনতৃপ্ত অতিথিদের কাছে থেকে। খরাদাহ উপন্যাসে এ-ছবিটি বড় চমৎকারভাবে এসেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে এমনটি এঁকে দেওয়া সম্ভব নয় : 'যথারীতি হেডবাবুর্চির আবির্ভাব ঘটে। কেউ তলব করে না, তবু মাথা নাড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিতে থাকে, জী পাক ক্যামুন হয়্যাছে আঁ? দলিল তার বরসুলভ গাম্ভীর্যের ভান ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, ফাস্কিলাস্! আপুনকাকে শউরে লিয়্যা যাবো হাঁ। ...' এক একটা বাক্যে বিদ্যুতের মতো চলকে উঠেছে এক একটি বাস্তব ঘটনা ও চরিত্র ব্রাত্যভাষার উইটি ব্যবহারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ– 'কিসমত খবরদারি করছিলো। বড়ো ছেলেটিকে হুকুম দ্যায়, পটক্যারা। দুল্যাভাইয়ের মস্তকট্যে বাড়ির ভিত্রি লিয়্যে যা। পাটায় ছেঁচ্যা লিয়্যায়।'

এমন রূঢ় ও রসালো সংলাপের মধ্যেই আবার একটি রোমান্টিক সংলাপের পরিবেশও কখন জানি নীরবে মানিয়ে যায়। রাতের বেলা পুকুরপাড়ে ভল্লা-চিকনদাসীর প্রথম সাক্ষাতের সংলাপ এই কাহিনির একটি স্মরণীয় অংশ : হামাক ই খরার লরক থাক্যা লিয়্যা যাবি ভল্লা?

লিব্যো।
কুনঠে সি? পানির দ্যাশে?
লিব্যো।
আঃ! ভাতের দ্যাশে?
লিব্যো।
আঃ! গাছের দ্যাশে?
লিব্যো।
আঃ হায় গ! মানহুষের দ্যাশে লিব্যি?
লিব্যো।

এটা অবশ্য একটি ব্যতিক্রমী অংশ। বরং ভাষা-সংলাপের স্বাভাবিক রসোজ্জ্বল উদাহরণগুলোতে ফিরে আসি। পালকির মধ্যে বরবধূর যে-কথোপকথন খরাদাহ উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা যেমন বিচিত্র, তেমনি অভিনব। বর দলিল তার সদ্যবিবাহিত স্ত্রী চিকনদাসীকে আত্মপরিচয় দিচ্ছে : 'অসভ্য সঙ

অমনি ফট করে বলে দ্যায়, ববুজান গ, হামি তো জরমোহিঁজরা। হামার যে স্যা নাইখ। বলতে বলতে পেন্টুলেন বোতাম খুলে তলাকার ম্যাজিক দেখিয়ে দ্যায়।'

একেবারে উপসংহারে এসে গোটা উপন্যাসের সারসংবাদটি অবশ্য খরাসাক্ষী কাঁঠালগাছ অবিকল বরীন বাংলায় শোনায় আমাদের– 'হামার ই হাড্ডিগুড্ডিসার শরীলখান। সাজসজ্জা নাইখ। উ শালোর জোদ্দারমার্কা খরাট্যে শুষ্যা শষ্যা শুখায়্যা লিয়্যাছে। ... হামার ই হাড়কাঠামো লিয়্যা হামি কালীম্যাঘের আওয়াজ শুনি গুমাগুম। খলখল বরখ্যার ঢল লাম্যে। হামি সোঁদা সোঁদা বাস পাই। হার লাতি-লাতিন আছে মাটির তলবাগে। ই বরখ্যায় অরা সভে জাগ্যা উঠবে। তুমহাকে ফল দিব্যে, রস দিব্যে। তুরা প্যাটপুরা খাবি। তুদের আওলাদ বাচ্চারা ভি খাব্যে। খাটো কদিন আর?'

একসময়ের শক্তিধর পুঁজিপতি মহাজন বাহাউদ্দিন উরুভাঙা দশায় বিশাল খাদের মধ্যে পড়ে থেকে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে এই উপন্যাসের দুর্জন পক্ষ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্ত্যপর্বে দ্বৈপায়ন হ্রদে উরুভাঙা দুর্যোধনের অর্ধমগ্ন দশার আদলে বাহাউদ্দিনের এই পতনদৃশ্য আঁকা সুপ্রযুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে, উদ্বাস্তু কিসমত সপরিবার সর্বনাশা অগস্ত্যযাত্রায় চলেছে। সঙ্গে পোষা কুকুর গদা। এ একেবারে সেই মহাভারতের শেষপর্বে হিমালয় পাড়ি দিয়ে স্বর্গের পথে পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান-যাত্রার দৃশ্য। এমনকি, নানীবুড়িও রসিকতা করে গদাকে বলে, 'ভোটান যাবি আ গদা? হেমালয় যাবি আ গদা?' মহাপ্রস্থানের পথযাত্রী যুধিষ্ঠিরের শেষ সঙ্গীটি ছিল ধর্মবেশী কুকুর।লেখকের অন্যান্য উপন্যাসেও এ রকম ব্রাত্যজন ও ব্রাত্যজনের ভাষা থাকলেও এই দুটো উপন্যাসের মত অতটা প্রাবল্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

আবুবকর সিদ্দিক একই সঙ্গে কবিতা ও গল্প রচনা শুরু করলেও তাঁর গল্পগ্রন্থ প্রকাশে বেশ বিলম্ব ঘটে। মরে বাচার স্বাধীনতা' গল্পে তিনি পৌঁছে গেছেন মাটির সমতলে থাকা মানুষের কাছে।

"হরমুজের মুখদিয়ে তখন সাদা গ্যাঁজা গড়াচ্ছে। চোখে আলিঝালি খেলছে।তবু কানের ফুটোদুটো পরিষ্কার খোলা রয়ে গেছে। তার বরাতে মিন মিন আওয়াজ শুনতে পায় সেঃ আরে ও-ই মিয়া! হুনছোনি? আল্লার বান্দারে আজাব দিতাছো। ক্যান?ইডা কোন্ নাছারা কাম! হুশির মাতা খাইছো মিয়া? খানিক পর আবার শুনতে পায়। মিয়াবাইর হুলুকচুলুক ঠেহি না য্যান্। খাইবানি? দুগা গুড়মুড়ি দুবোনি মুহির মধ্যি?"

'ফজরালি হেঁটে যায়' গল্পের চরিত্রগুলো যেনো গ্রাম থেকে ধরে ধরে গল্পের মাঝে বসিয়ে দিয়েছে।, "শিকারের খোঁজে সারারাত ঢুঁড়ে ফেরে গাঁওখান। শফি দুধ অলার বউ, হারুকামারের বোন, ফজরালির মা, কোড়লঠাকুরের মেয়ে.... উধাও হয়ে যায়।"

গল্পে ব্যবহৃত শব্দগুলো দেখলেই বোঝা যায় লেখক কতটা আন্তরিকতা নিয়ে ব্রাত্যজনের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন। তৎকালীন সময় যেমন চিহ্নিত হয়েছে তেমনি সমাজের মানুষের মুখের ভাষা লক্ষণীয় ভাবে তুলে ধরেছেন 'মানুষ থেকে দূরে' গল্পে। "ঢোকার সময় কত বিরাট লেগেছিলো ইউনিভার্সিটিটাকে। একগন মুঠোবন্দী পিং পং বল হয়ে এসেছে। গোটা দেশটাই টেনিস বল।...

সবকিছু ফুররর করে উড়ে যায়।”

এরকম অসংখ্য গল্পে লেখক ব্রাত্যজনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছেন। অসংখ্য দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লেখকের গল্প সম্ভারে।

প্রকাশিত ছোটগল্পগ্রন্থসমূহ : ভূমিহীন দেশ (১৯৮৫), চরবিনাশকাল (১৯৮৭), মরে বাঁচার স্বাধীনতা (১৯৮৭), কুয়ো থেকে বেরিয়ে (১৯৯৪) এবং ছায়াপ্রধান অঘ্রান (২০০০)। কবিতার মতো তাঁর গল্পসমূহ প্রজ্ঞাদীপ্ত; কখনো প্রচ্ছন্ন, প্রয়োজনে সাহসিক এবং ভিন্নমাত্রিক। চটুল প্রেমের প্রাবল্য নয়। সামগ্রিক ঐতিহ্য, একাত্তরের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের জনজীবন, শোষণ-নির্যাতন এবং চিরন্তন মানবিক ও হৃদয়বৃত্তিক উপলব্ধির শিল্পরূপই হচ্ছে তাঁর ছোটগল্প। বিষয়ের গুরুত্বে এবং নির্মাণশিল্পের কুশলতায় তাঁর গল্প বোদ্ধাপাঠকের কাছে হয়েছে নন্দিত।

আবুবকর সিদ্দিক মোহমুক্ত ও নিরাসক্ত জীবনদ্রষ্টা। নির্মম কালপুরুষের মতো তিনি বাংলাদেশের শোষিত মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনসত্যকে ভূমিহীন দেশের (১৯৮৫) ‘ভূমিহীন দেশ’ গল্পে চিত্রিত করেন। এ-গ্রন্থের নামকরণের নেপথ্যে রয়েছে গল্পকারের অসাধারণ সাহস, আন্তরিকতম বেদনাবোধ, দায়বদ্ধপ্রজ্ঞা এবং নবলব্ধ স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পটভূমির আবেগবর্জিত ইতিহাস। স্বাধীনতা ভোগের অধিকার থেকে দুঃখজনকভাবে বঞ্চিত হয় দেশের অধিকাংশ মানুষ। তাদের পায়ের তলায় বেঁচে থাকার প্রত্যয়পুষ্ট মাটি সরে যায়। স্বাধীনতা-উত্তর সমস্ত সৌভাগ্য ও সম্পদ চিরাচরিত কায়দায় ভোগ করে এক বিশেষ শ্রেণি। লেখকের শৈল্পিক প্রতিবাদ এখানেই এবং তারই ধারাবাহিক প্রকাশ মরে বাঁচার স্বাধীনতা (১৯৮৭) গল্পগ্রন্থ, যা মুক্তিযুদ্ধের শিল্পদলিল হিসেবে স্বীকৃত। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের নামগল্প ছাড়াও ‘বেলুনওয়ালা’, ‘খালখসা লাল কংকাল’, ‘ভূতপ্যাদানী’, ‘খাদ্য মন্ত্রণালয় কতো দূরে’, ‘চন্দনের ঘূণ’, ‘লাশের নাম নেই’, ‘খতম’, ‘এই সেই জয় বাংলা’, ‘ফজরালি হেঁটে যায়’, ‘রক্তগর্জন’ ও ‘খোঁড়া সমাজ’ গল্পের কোথাও কৃত্রিমতার ফাঁক নেই; নেই অতিরঞ্জনের সস্তা রঙ। আছে একটি উদ্বেল আশা ঘিরে যোদ্ধাহৃদয়ের অমিত উচ্চারণ আর আশাভঙ্গের গুপ্তক্ষত থেকে ঝরে পড়া ব্যক্তিগত যন্ত্রণা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা নিয়ে এত সৎ, এত খাঁটি গল্প আমাদের কথাসাহিত্যে বিরলপ্রায়। চরবিনাশকাল (১৯৮৭) গল্পগ্রন্থের সাতটি গল্পে রূপক-প্রতীকী ভাষায় মানবজীবনের কিছু অস্তিত্বের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। কিছু আশ্চর্য নর-নারী, তাঁদের সূক্ষ্মানুভূতি, সমাজবিন্যাসের বাঁকাচোরা গ্রন্থিতে তির্যক অস্তিত্বের অনিকেত চেহারা, কখনোবা অমোঘ ফুসলানিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা অসহায় মানুষের স্মৃতিতে তপ্ত হয়ে-ওঠা জীবনের স্পন্দন; এসবই সংবেদনশীল ভঙ্গিতে, পরাবাস্তব আর রোমান্টিকতার মাধ্যমে গল্পরূপ দেন আবুবকর সিদ্দিক। স্বল্পায়ু সংসারে বিমূঢ় মানুষের কথাচিত্র চরবিনাশকালে বিধৃত হলেও বস্তুবাদী সিদ্দিককে চিনে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না। কুয়ো থেকে বেরিয়ে (১৯৯৪) গল্পগ্রন্থে তাঁর এ-পরিচিতি অধিক সমুজ্জ্বল। যে-কোনো গণ্ডির ক্ষুদ্রতা ক্লান্ত করে তোলে মনকে। অতিঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেও অতলস্পর্শী ফাঁক থাকে। সমাজবন্ধনের অনেক গ্রন্থিই টোটাফাটা। মুক্তিকামী মানুষ তাই সীমাবদ্ধ বন্ধন ছিঁড়ে-কেটে বেরিয়ে আসতে চায় কুয়ো থেকে সীমাহীন সমুদ্রের পানে। কী অদ্ভুত এই মুক্তিপিপাসার রূপকধর্মী

রূপায়ণ। এর ভাষার স্তরে স্তরে প্রতীকের জাদুস্পর্শ। 'কোথায় যাবেন?' চলমান এ ধুয়ো যেন নিখিল মানুষের চিরকালীন মুক্তিযাত্রার আর্তিরূপে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে গল্পকারের লেখনীশক্তিতে। ছায়াপ্রধান অঘ্রাণ (২০০০) গল্পসংকলনেও রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র, গ্রামীণজীবন, ধর্মীয় অন্ধত্ব, শোষণ-নির্যাতন গাল্পিকের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব রচনাশৈলীতে নির্মিত হয়েছে। কান্নাদাসী (২০০৬), হংসভাসীর তীরে (২০০৮), কালাকুম্ভীর (২০০৮), মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প : মুক্তিলাল অভ্যুদয় (২০০৮), মধুবন্তী (২০০৯) এবং বরীনভূমি-বাদাবন (২০১৭) গ্রন্থের প্রতিটি গল্পই ভিন্নমাত্রিক ও ব্রাত্যজীবনঘনিষ্ঠ। আবুবকর সিদ্দিকের অভিজ্ঞতা, মেধা, শ্রমসাধনা এসব গল্পে প্রতিফলিত। আঙ্গিকও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।

তথ্য সহায়ক গ্রন্থ :

১। দেশ ও দশের গল্প, আবুবকর সিদ্দিক, অনুভবা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।
২। জলরাক্ষস, আবু বকর সিদ্দিক, শোভাপ্রকাশ ১৯৮৪ খ্রি।
৩। খরাদাহ, আবু বকর সিদ্দিক, মুক্তধারা প্রকাশিত ১৯৮৭ সালের প্রথম সংস্করণ।
৪। কালি ও কলম পত্রিকা, আবুবকর সিদ্দিকের উপন্যাসে জলযুদ্ধ ও খরাপীড়ন, মোহাম্মদ জয়েনুদ্দীন, নভেম্বর ২০২১খ্রি.।
৫। কালি ও কলম পত্রিকা-আবুবকর সিদ্দিকঃ বহুমুখী প্রতিভার প্রতিভূ মোহাম্মদ জয়েনুদ্দীন, ডিসেম্বর ২০১৯খ্রি.।
৬। ভাটির দেশ-অমিতাভ ঘোষ, আনন্দ প্রকাশনী, নভেম্বর-২০০৯।

একুশের লড়াই : সংস্কৃতির মুক্তি

রূপা দাস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

এই রঙ্গভরা বঙ্গদেশের নৈসর্গিক ও মানসিক মেজাজ যে দশায় থাক না কেন, একঘেয়ে আত্মীয়ের মত ঋতু পরিক্রমায় একুশকে প্রতিবছর অনিবার্যভাবে হাজিরা দিতে হয়। একুশের মান আমরা উন্নত করেছি। তাকে বসিয়ে দিয়েছি ব্যয়বহুল সরকারি মঞ্চের প্রসাধন চিহ্নিত আসনে। সরকারি বেতার-টিভিতে একুশের চেতনার সুখ সমৃদ্ধি কিলবিল করে। স্কুল-কলেজ-অফিসের আইনী সনদে ছুটির ঘনঘটা। কিন্তু খাপখোলা বাস্তবতা হলো স্বীকৃতির ৭৪ বছর পরও একুশের সাংস্কৃতিক মুক্তি ঘটেনি। তার টালমাটাল অস্তিত্বের টুঁটি চেপে বসে আছে এ বঙ্গের এক আদিম পাশবিকতা। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মালিক-মজুর, নির্বিশেষে আমজনতার মননে একুশে আসন গাড়েনি। উৎসবমত্তা উজ্জ্বল রমণী একুশকে কঙ্কালসার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্ফীতোদর ভাগ্যবানের দল আজও প্রতিনিয়ত ব্যবচ্ছেদ করছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেও সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মহলে ভাষা বিষয়ক উল্লেখযোগ্য চিন্তা ভাবনা ছিল। ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম প্রাদেশিক কাউন্সিলের সামনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পেশ করেন। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারত বিভাগের রোয়েদাদ ঘোষণার পর কামরুদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোহফা, তাজউদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ প্রমুখ নেতৃবর্গের দ্বারা গঠিত গ্রুপ "আশু দাবি কর্মসূচি আদর্শ" নামে যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন তাতে বলা হয় "মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করিতে হইবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশে যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা।" ১৯৪৭ এর পর থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর পূর্ব সময়টায় মূলত পাকিস্তানের ইতিহাস ছিল ঘোরতর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিবৃত্ত। ভারতবিভাগ হতে ১৯৫২ পর্যন্ত বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব, নৃশংস পদক্ষেপ যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিষময় প্রকাশ– তা কারোর অজানা নয়।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একটি রূপ ছিল বাংলা হরফ পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের চেষ্টার প্রধান প্রবক্তা পূর্ব বাংলায় প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান। ১৯৪৭ থেকে শুরু হওয়া এ অপচেষ্টা ভালোভাবে দানা বাঁধে ১৯৪৯ সালে। ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আরবি হরফে

বাংলা প্রবর্তনের ব্যাপারে ব্যাপক পদক্ষেপ দেখা যায়। বাংলা হরফ পরিবর্তন, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা দান, সরকারি বাজেটে অর্থ বরাদ্দ, পরিবর্তিত হরফে বই ছাপানো, বিনামূল্যে বিতরণ-সর্বোপরি এরূপ পাঠ্যপুস্তক রচনাকারীকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণাও কেন্দ্রীয় সরকার করে।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তের আরো একটি বিষয় হলো ভাষা সংস্কারের নামে নানাবিধ অবাস্তব পরিবর্তনের অপচেষ্টা। পূর্ব বাংলার প্রচলিত বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ, সহজীকরণ ও সংস্কার বিষয়ক বিভিন্ন চক্রান্ত তৎকালে বেশ দানা বেঁধে ওঠে। ভারত বিভক্তির পর থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েন, অর্থনৈতিক দুর্দশা, বিশেষত: বিপুল খাদ্যাভাব, যাতায়াতের দুরবস্থা, দুর্নীতি, চোরাকারবারি- নানাবিধ বিশৃঙ্খলার পাশাপাশি পূর্ব বাংলার ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী মহলকে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য মিছিল-মিটিং, পিকেটিং, ক্লাশ বর্জন, পুলিশের লাঠিচার্জ, কারাবরণ, আহত থেকে মৃত্যু– অর্থাৎ সেসব দুর্ভোগের স্বীকার হতে হয়েছে তার বহর অতি দীর্ঘ। অবশেষে ২১ শে ফেব্রুয়ারির সেই মর্মান্তিক ঘটনার ফলস্বরূপ বাংলা ভাষার স্বীকৃতি।

কেউ কেউ বলেন, একুশের লড়াই সংস্কৃতির মুক্তির। অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক মুক্তির মেলবন্ধনে আমাদের পোড়োবাড়ির ভাঙ্গা দরজাটা মেলবার কথা ছিল। এই দুই মুক্তির লড়াইয়ের জন্মদিন হিসেবে আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করতে পারতাম। কিন্তু একাত্তরোত্তর স্বাধীন দেশের ফড়িয়া রাজনীতিবিদ-বুদ্ধিজীবীরা আর্থ-সাংস্কৃতিক মুক্তির সম্মীলন না ঘটিয়ে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। বাংলাদেশ একুশের সন্তান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা একুশের উত্তরাধিকার। ফেব্রুয়ারি বাঙালির আত্ম আবিষ্কারের, আত্ম প্রতিষ্ঠার মাস। আজও আমরা জাতি হিসেবে উন্মাতাল অথচ স্থবির। তার ছুঁৎ লেগেছে একুশের বইমেলায়। এই রাহু কেন আমাদের আজও গ্রাস করে আছে তার ব্যাখ্যা মনস্তাত্বিক। আমরা সন্ত্রাসী বেষ্টনীর মধ্যে নিঃশ্বাস টানতে টানতেও সংস্কৃতির মুক্তি চাই, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকাকে সেই নির্লজ্জ আর হীনমন্য মাৎসর্যে ভোগা ভুতের কবল থেকে মুক্ত রাখতে চাই। আউল-বাউল-লালনের দেশে একুশের ফলশ্রুত স্বাধীনতা আমাদের মুক্তির সনদ এনে দিক।

“এবারের উৎসবে
কানা-খোড়া সবাইকেই চাই
হাতের লাটাই
আর ঘুড়ি
দু-তরফ, হা ভাইজান, থুড়ি
চারোতরফ মিল মিশিয়ে তো মেলা
সুতরাং
যেখানেই থাকো
একবার মন-মন কাজে এলেই হবে।”
(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশের ইতিহাস : সিরাজুল ইসলাম

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

মোঃ কামালউদ্দিন
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

নির্বাচন হলো আজকের পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। যে পদ্ধতিতে আমরা প্রতিনিধি নির্বাচন করি তাই হলো নির্বাচন। প্রায় প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি বাছাই করে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত অনেক নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। তার মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩ বার। জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের আইনসভার সদস্য নির্বাচন করার পদ্ধতি। প্রতি পাঁচ বছর পর পর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ লেখার মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

১ম নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ৭ই মার্চ, ১৯৭৩ খ্রি.

ফলাফল :

বিজয়ী : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৯৩ আসনে জয়লাভ করে।

অন্যান্য দল : জাসদ ০১ আসন, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ০১ আসন, স্বতন্ত্র ০৫ আসনে জয়লাভ করে।

ভোট প্রদানের হার : ৫৫.৬১%

মন্তব্য : এটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন। এ নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে ১১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। এই নির্বাচন নিয়েও বিতর্ক ছিল ।

২য় নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ খ্রি.

ফলাফল :

বিজয়ী : বিএনপি ২০৭ আসনে জয়লাভ করে।

অন্যান্য দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) ৩৯ আসন, মুসলিম লীগ ২০, জাসদ ০৮, স্বতন্ত্র ১৬, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান) ০২ আসন ও অন্যান্য ০৮ আসনে জয়লাভ করে।

ভোট প্রদানের হার : ৪৯.৬৭%

মন্তব্য : বিএনপির অংশগ্রহণে প্রথম নির্বাচন। এই নির্বাচন নিয়েও বিতর্ক ছিল ।

৩য় নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ৭ই মে, ১৯৮৬ খ্রি.

ফলাফল :

বিজয়ী : জাতীয় পার্টি ১৫৩ আসনে জয়লাভ করে।

অন্যান্য দল : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৭৬ আসন, জামায়াতে ইসলামী ১০, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব) ০৪, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ) ০৩, মুসলীম লীগ ০৪, ঐক্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ০৫, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ০৫, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ ০৩, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ০৩ এবং স্বতন্ত্র ৩২ আসনে জয়লাভ করে।

ভোট প্রদানের হার : ৬০.৩৭%

মন্তব্য : জাতীয় পার্টির অংশগ্রহণে প্রথম নির্বাচন। এ নির্বাচন বিএনপি বর্জন করে। এই নির্বাচন নিয়েও ব্যাপক কারচুপি অভিযোগ ও বিতর্ক ছিল ।

৪র্থ নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ৩রা মার্চ, ১৯৮৮ খ্রি.

ফলাফল :

বিজয়ী : জাতীয় পার্টি ২৫১ আসনে জয়লাভ করে।

অন্যান্য দল : সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯, বাংলাদেশ ফ্রিডম পার্টি ০২ ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ) ০৩ এবং স্বতন্ত্র ২৫ আসনে জয়লাভ করে।

ভোট প্রদানের হার : ৫৪.৯৩%

মন্তব্য : বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী এ নির্বাচন বর্জন করে। এ নির্বাচন একটি একতরফা নির্বাচন বলে পরিচিতি পায়।

৫ম নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ খ্রি.

বিজয়ী : বিএনপি ১৪০ আসনে জয়লাভ করে।

অন্যান্য দল : আওয়ামী লীগ ৮৮ ও জাতীয় পার্টি ৩৫ এবং জামায়াতে ইসলামী ১৮, বাংলাদেশ কৃষক

শ্রমিক আওয়ামী লীগ ০৫, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ০৫, অনান্য দল ০৬ ও স্বতন্ত্র ০৩ আসনে জয়লাভ করে।

ভোট প্রদানের হার : ৫৫.৪৫%

মন্তব্য : এটি অন্তবর্তী সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন। জামায়াতের সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠন করে।

৬ষ্ঠ নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ খ্রি.

বিজয়ী : বিএনপি ২৭৮ আসনে জয়লাভ করে।

অন্যান্য দল : ফ্রিডম পার্টি ১ আসন ও স্বতন্ত্র ১০ আসনে জয়লাভ করে। ১০টি আসনের ফলাফল অসমাপ্ত থাকে ও আদালতের রায়ে ১টি আসনের নির্বাচন স্থগিত থাকে।

ভোট প্রদানের হার : ২৬.৫৬%

মন্তব্য : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতসহ সকল বিরোধী দল এ নির্বাচন বর্জন করে। এ সংসদে বিএনপি সরকার গঠন করে এবং স্বল্পমেয়াদী এ সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ঐতিহাসিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭ম নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ১২ই জুন, ১৯৯৬ খ্রি.

বিজয়ী : আওয়ামী লীগ ১৪৬ আসনে জয়লাভ করে।

অন্যান্য দল : বিএনপি ১১৬ ও জাতীয় পার্টি ৩২ এবং জামায়াতে ইসলামী ০৩, অনান্য দল ০২ ও স্বতন্ত্র ০১টি আসনে জয়লাভ করে।

ভোট প্রদানের হার : ৭৪.৯৬%

মন্তব্য : এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন। ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টির সমর্থনে সরকার গঠন করে।

৮ম নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ১লা অক্টোবর, ২০০১ খ্রি.

বিজয়ী : বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট ২১৬ আসন (বিএনপি ১৯৩ আসনে জয়লাভ করে। জামায়াতে ইসলামী ১৭, ইসলামী ঐক্যজোট ০২, বিজেপি ০৪ আসনে জয়লাভ করে)।

অন্যান্য দল : আওয়ামী লীগ ৬২, ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ১৪, জাপা (মঞ্জু) ০১, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ০১ ও স্বতন্ত্র ০৬ আসনে জয়লাভ করে।

ভোট প্রদানের হার : ৭৫.৫৯%

মন্তব্য : এর মাধ্যমে জোটগত নির্বাচনের প্রভাব শুরু হতে থাকে।

৯ম নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ২৯শে ডিসেম্বর, ২০০৮ খ্রি.

বিজয়ী : আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট-২৬৩ আসন (আওয়ামী লীগ ২৩০ আসন, জাতীয় পার্টি এরশাদ ২৭, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ০৩, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ০২ ও এলডিপি ০১ আসনে জয়লাভ করে)।

অন্যান্য দল : বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ৩৩ ও স্বতন্ত্র ০৪ আসনে জয়লাভ করে।

ভোট প্রদানের হার : ৮৭.১৩%

মন্তব্য : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে রেকর্ড পরিমাণ ভোট পড়ে এ নির্বাচনে।

১০ম নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ৫ই জুন, ২০১৪ খ্রি.

বিজয়ী : আওয়ামী লীগ ২৩৪ আসনে জয়লাভ করে।

বিরোধী দল : জাতীয় পার্টি ৩৪, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ০৫, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ০৬, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ০১, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ০২, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) ০২ ও স্বতন্ত্র ১৬ আসনে জয়লাভ করে।

ভোট প্রদানের হার ৪০.০৪%

মন্তব্য : বিএনপি ও তাদের জোট এ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে বর্জন করে। এ নির্বাচনে রেকর্ড ১৫৩ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়।

<u>১১তম নির্বাচন</u>

অনুষ্ঠিত হয় : ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি.

বিজয়ী : আওয়ামী লীগ ২৫৮ আসনে জয়লাভ করে।

বিরোধী দল : বিএনপি ০৬ ও জাতীয় পার্টি ২২, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ০৪, জাসদ ০২, গণফোরাম ০২, স্বতন্ত্র ০২, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) ০১, বিকল্প ধারা বাংলাদেশ ০২, তরিকত ফেডারেশন ০১ আসনে

জয়লাভ করে।

ভোট প্রদানের হার : ৮০.২০%

মন্তব্য : এ নির্বাচনে সকল দল অংশগ্রহণ করলেও রাতের আঁধারে সীল মারার অভিযোগ রয়েছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। যা রাতের ভোট হিসেবে চিহ্নিত হয়।

১২তম নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ৭ই জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি.

বিজয়ী : আওয়ামী লীগ ২২৪ আসনে জয়লাভ করে।

বিরোধী দল : জাতীয় পার্টি ১১, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ০১, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ০১, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ০১ ও স্বতন্ত্র ৬২ আসনে জয়লাভ করে।

ভোট প্রদানের হার : ৪১.৮১%

মন্তব্য : বিএনপি ও সমমনা দলসমূহ এ নির্বাচন বর্জন করে। মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও তাদের বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে। এ জন্য এই নির্বাচন ডামি নির্বাচন হিসেবে পরিচিতি পায়।

১৩তম নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয় : ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রি.

বিজয়ী : বিএনপি ২০৯ (২১১-২টি আসনে মামলাজনিত কারণে ফলাফল স্থগিত) আসনে জয়লাভ করে।

বিরোধী দল : জামায়াতে ইসলামী ৬৮ আসন ও এনসিপি ০৬ আসন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ০২, খেলাফত মজলিশ ০১, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ০১, গণঅধিকার পরিষদ ০১, গণসংহতি আন্দোলন ০১, বিজেপি ০১, স্বতন্ত্র ০৭ আসনে জয়লাভ করে। ১টি আসনে প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়।

ভোট প্রদানের হার : ৫৯.৪৪%

মন্তব্য : এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে নাই। এ নির্বাচনের সাথে জুলাই জাতীয় সনদ প্রশ্নে গণভোটও অনুষ্ঠিত হয়। গণভোট পড়ে ৬০.২৬%, (হ্যাঁ ৬৮.৫৯%)

আগামীতে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সকল নির্বাচন পেশিশক্তি ও কালো টাকা মুক্ত, সুষ্ঠু ও সুন্দর হোক এ প্রত্যাশা সকলের।

ইরান কেন পশ্চিমাদের শত্রু

মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

ইরানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইরান, যা ঐতিহাসিকভাবে পারস্য এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি প্রজাতন্ত্রী ইরান নামে পরিচিত। এর উত্তর পশ্চিমে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান, উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর, উত্তর-পূর্বে তুর্কমেনিস্তান, পূর্বে আফগানিস্তান, দক্ষিণ-পূর্বে পাকিস্তান, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর এবং পশ্চিমে তুরস্ক ও ইরাক অবস্থিত। ইউরেশিয়ার কেন্দ্রে এবং হরমুজ প্রণালীর নিকটে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি ভূ-কৌশলগতভাবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইরানের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর তেহরান। ইরানের জনসংখ্যা ৮ কোটি ৩০ লক্ষ এবং আয়তন ১৬,৪৮,১৯৫ বর্গকিলোমিটার।

দেশটির জনগণ জাতিগত ও ভাষাগতভাবে বিচিত্র হলেও এরা প্রায় সবাই মুসলিম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ অঞ্চলটি শিয়া মুসলমানদের কেন্দ্র। ইরানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার আছে। পারস্য উপসাগরের অন্যান্য তেলসমৃদ্ধ দেশের মতো ইরানেও তেল রপ্তানি ২০ শতকের শুরু থেকে দেশটির অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি।

১৯৩৫ সালে ইরানের শাসক দেশটিকে কেবল "ইরান" বলে ডাকার অনুরোধ জানানোর পর থেকে এখন এই নামেই সারা বিশ্বে দেশটি পরিচিত। ১৫০১ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত রাজতন্ত্রী ইরান শাহ কিংবা রাজারা শাসন করতেন। ১৯৭৯ সালে ইরানি বিপ্লব গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের পতন ঘটায় এবং ইরান একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্রে রূপলাভ করে।

যেভাবে পশ্চিমাদের শত্রু

রেজাশাহ পাহলভি ব্রিটিশদের গোপন সাহায্যে ১৯২৫-এ কাজার শাহকে সরিয়ে ইরানের ক্ষমতায় বসে।

ব্রিটিশ সাহায্য নিলেও ১৯৩৩ পরবর্তী কিছু সিদ্ধান্ত নেয় যা ব্রিটেনকে ক্ষুব্ধ করে। যেমন– ব্রিটিশ তেল কোম্পানি AIOC- এর সঙ্গে চুক্তি সংশোধন করে তেলের লভ্যাংশ ২০% বাড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

রেজাশাহ নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। তার নিরপেক্ষতাকে ব্রিটিশরা বিশ্বাস করে না। কারণ রেজা প্রায় ৮০০ জন জার্মান প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের ইরানের বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ দেয়। ব্রিটিশরা মনে করে সে জার্মানপন্থী।

রাশিয়া ও ব্রিটেন মিলে ১৯৪১ সালে ইরান দখল করে। রেজা শাহকে আফ্রিকাতে নির্বাসনে পাঠায়। তার ছেলে মোহাম্মদ রেজাকে ক্ষমতায় বসায়। বাঁচার স্বার্থে পিতার জার্মানপন্থা থেকে বের হয়ে ব্রিটেনের পাপেট হিসেবে কাজ শুরু করে। মোহাম্মদ রেজার ক্ষমতায় থাকাবস্থায় মজলিস সদস্য মোসাদ্দেক তেল জাতীয়করণের আন্দোলন করে। ১৯৫১ সালে মজলিস তাকে প্রধানমন্ত্রী বানায়। তেল জাতীয়করণ করলে ব্রিটিশরা ক্ষেপে যায়। আমেরিকা আর ব্রিটিশ মিলে অপারেশন আজাক্স নামে অভ্যুত্থান চালিয়ে মোসাদ্দেকের পতন ঘটায়। ১৯৫৩ সালে আবারও রেজা শাহের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

রেজা, তথা ব্রিটেন - আমেরিকা ১৯৫০ সালে ইরানের হয়ে ইজরায়েলকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। গোপনে সামরিক ও তেল বাণিজ্য করে। বিনিময়ে মোসাদ ও সিআইএ মিলে ইরানি গোয়েন্দা সংস্থা SAVAK প্রতিষ্ঠা করে দেয়। তারপর থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত ব্রিটিশ- আমেরিকা সুখে শান্তিতে ইরানকে ভোগ করতে থাকে। মূলত, এই SAVAK ইসলামি বিপ্লবের আগ পর্যন্ত ইরানকে চালিয়েছে। পরোক্ষভাবে, মোসাদ ও সিআইএ পরিচালিত ছিলো ইরানের সরকার। ইজরাইল-মার্কিনি সরকার পশ্চিমা স্টাইলে ইরানকে আধুনিক করতে সেক্যুলার শিক্ষা, পোশাক সংস্কার, ইউরোপীয় স্যুট উৎসাহিত করা, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি শুরু করে - যার নাম দিয়েছিল "সাদা বিপ্লব।" আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি এটাকে জাতীয় অপমান হিসেবে চিহ্নিত করেন। প্রথম সুপ্রিম লিডার 'সাদা বিপ্লবের' বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে। SAVAK তাকে গ্রেফতার করে নির্বাসনে পাঠায় তুরস্কে ১৯৬৪ সালে। তুরস্ক থেকে খোমেনি চলে যান ইরাকে। শিয়া এলাকায় মাদ্রাসা খোলেন। ইরানের চাপে সাদ্দাম তাকে বের করে দেয়। খোমেনি যান ফ্রান্সে।

১৯৭৮- এ অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব ও সাভাক তথা মোসাদ ও সিআইএ তথা মার্কিনি সরকারের নির্যাতনে জনক্ষোভ তৈরি হয়। ফ্রান্স থেকে ক্যাসেট টেপে বিপ্লবী বাণী পাঠিয়ে খোমেনি লড়াই শুরু করেন। সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়। শাহ দেশত্যাগ করেন। ইরান সরকারের পতন ঘটে। বিপ্লব সফল হয়। খোমেনি দেশে ফেরেন। গণভোটে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ৯৮.২% হ্যাঁ ভোট পড়ে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

শরিয়াভিত্তিক বিচারব্যবস্থা, হিজাব বাধ্যতামূলক, পশ্চিমা সংস্কৃতি নিষিদ্ধ, সাভাক বিলুপ্তি, পশ্চিমা প্রভাব বিলুপ্তি ইত্যাদি সংস্কার করে। অর্থাৎ শাহের পতন থেকে ইরানকে ব্রিটেন, ইজরায়েল, আমেরিকা শত্রু গণ্য করে।

এই শত্রুতা প্রকাশ্যে আসে - আমেরিকা কিভাবে, সাভাকের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, সেনাবাহিনী

এবং তেলনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো তার সব নথি ছিলো আমেরিকান দূতাবাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকা ইরানকে চালিয়েছে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত। তেল থাকা সত্ত্বেও ইরান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতি করতে পারেনি এজন্যই। নথিপত্র পেয়ে ইরানিদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তারা দূতাবাসের ৫২ জন কর্মকর্তাকে ৪৪৪ দিন জিম্মি করে রাখে। খোমেনি এটাকে "জিম্মিদের বিচার" বলে সমর্থন দেন।

সেই থেকে ইজরায়েল– আমেরিকা ইরানের চিরস্থায়ী শত্রু। ব্রিটেন তো আগে থেকেই, আর রাশিয়া থেকেই শত্রু। সম্পর্ক ভালো হয় অনেক পরে। পশ্চিমের মোড়লরা শত্রু, হলে তাদের সব অনুসারী শত্রু হতে বাধ্য।

এবারে আসে মিডলইস্ট

আরবরা ভয় পায়, একই বিপ্লব আরবে ঘটতে পারে। ফলে বিপ্লবোত্তর ইরানকে দূর্বল পেয়ে সাদ্দাম ইরান আক্রমণ করে। সৌদি ও কুয়েত ইরাককে সমর্থন দেয়। এদিকে ইরাক - ইরান যুদ্ধ চললে ওদের তেল উৎপাদন কমবে। ফলে গালফ দেশগুলি বেশি তেল বিক্রি করে বেশি অর্থ আয় করতে পারবে। এজন্য সাদ্দামকে সৌদি দেয় ২৫ বিলিয়ন, কুয়েত দেয় ১৪ বিলিয়ন ডলার! অপরদিকে, সব পশ্চিমা দেশ সাদ্দামকে অস্ত্র, গোয়েন্দা তথ্য, স্যাটেলাইট ছবি দিয়ে হেল্প করে। অর্থাৎ ইরানের বিরুদ্ধে আরব - পশ্চিম জোটবদ্ধ হয়েছিলো যে, সেইটা আর ভাঙেনি। ইরানের উত্থান সমস্ত দালাল, বদমায়েশ, ক্ষমতালোভিদের জন্যে অবশ্যই হুমকি। সুতরাং ইরান বিশ্বের শত্রু হিশেবে পরিচিত হয়

পরে আসে ইজরায়েলের গেইম প্ল্যান

ইজরায়েলের টার্গেট মিসর, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন, জর্ডান, সিরিয়া, ইরাকের অংশকে ঘিরে গ্রেটার ইজরায়েল প্রতিষ্ঠা করা। ১৯১৭ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন জায়োনিস্ট মুখপাত্র লর্ড লিওয়ান্ডেল রথসচাইল্ডকে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর্থার বালফোর ফিলিস্তিনে ইহুদিদের "জাতীয় আবাসভূমি" প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। ফলে - ব্রিটেনকে "ইহুদী রাষ্ট্রের রক্ষক" হিসেবে তুলে ধরে রথচাইল্ড পরিবার ব্রিটেনকে আর্থিক সহযোগিতা দেয়। আমেরিকাকে প্রভাবিত করে, JP Morgan ব্যাংক থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়। ইহুদী সংবাদ মাধ্যমে দুনিয়াব্যাপী ব্রিটেনের পক্ষে জনমত তৈরি করে। কারণ ১৮ শতক থেকে ইউরোপের সবচেয়ে প্রভাবশালী ইহুদি ব্যাংকিং রাজবংশ ছিলো রথসচাইল্ড পরিবার। আমেরিকাতে ইহুদী লবিং অনেক শক্তিশালী ছিলো।

ব্রিটেন ফিলিস্তান দখল করে ফেলে ১৯১৭-এর ডিসেম্বরে। তখন তা অটোমানদের দখলে ছিলো। তারপর থেকেই শুরু হয় ইউরোপ থেকে ইহুদিদের ফিলিস্তিনে আবাসন। গত তিন দশকে খেয়াল করলে দেখাযায় যে - আরবের যেসব শাসক ও দেশ, ফিলিস্তিনের পক্ষে সোচ্চার ছিলো এবং কট্টর ইজরায়েল বিরোধী ছিলো। সুতরাং ইরানে ১৯৭৯ সালের আগের মতো পাপেট সরকার বসানোই একমাত্র লক্ষ্য - যেটার নাম দিয়েছে রেজিম চেঞ্জ।

এখন প্রশ্ন হলো - ইজরায়েলের পক্ষে আমেরিকা কেন চক্ষুলজ্জা ভুলে পড়িমরি করে মাঠে নেমেছে?

আমেরিকার লাভ অনেকগুলো।
আমেরিকান নেতাদের এপিস্টাইন ফাইল ধামাচাপা।
ইহুদীদের ফিন্যাশিয়াল ব্যাকাপের লোভ।
মধ্যপ্রাচ্যে তেল ও ক্ষমতার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ।

তেল, BRI (বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ), মধ্যপ্রাচ্য প্রক্সি- মানে চীনের অর্থনীতি ও ভূ-রাজনীতি ধস নামিয়ে চীনের উত্থান ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

রাশিয়ার অস্ত্র ব্যবসা লাটে উঠবে।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি. শনিবার থেকে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে আমেরিকা এবং ইসরায়েল। এই হামলায় নিহত হয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। দুই দেশের হামলার জবাব দিতে পালটা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। অনেকের মতে এই সংঘাত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট মোকাবেলায় পরিবেশসম্মত কৃষি

সাহারা বেগম
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

বর্তমানে সারা পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব দিনে দিনে প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ রকম অবস্থায় কৃষি, শস্য ও প্রাণবৈচিত্র্য খুবই হুমকির সম্মুখীন। বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশে এখন আর ছয় ঋতুর বেশ কয়েকটি আমরা বুঝতে পারি না। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টা খুবই জটিল কিন্তু বিষয়টা এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ আমাদের নাই। আমরা যখন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করি তখন আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ পরিস্থিতির মধ্যেই আছি। এখন জলবায়ু পরিবর্তন শব্দটাও পরিবর্তন করতে হচ্ছে। কেননা এখন শুধু জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে বললে চলছে না, এখন হচ্ছে 'জলবায়ু দুর্যোগ' (Climate disaster)।

জলবায়ু পরিবর্তন এখন জলবায়ু দুর্যোগে চলে গেছে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রধান ইন্ডিকেটর দুটি, প্রথমত বৃষ্টিপাত অপরটি তাপমাত্রা। জলবায়ু পরিবর্তনের একটি লক্ষণ হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। আমরা তাপমাত্রা বৃদ্ধির অবস্থায় আছি। অপর লক্ষণটি হচ্ছে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া। স্বাভাবিক বন্যা হওয়া আর এখনকার বন্যার মধ্যে আমরা পার্থক্য দেখি। যেমন, কখনো আগাম বন্যা হচ্ছে, কখনো পরে বন্যা হচ্ছে, আবার হঠাৎ করে বন্যা হচ্ছে। এখন জলোচ্ছ্বাস এবং নদী ভাঙনও বেড়ে গেছে। এটাও জলবায়ু পরিবর্তনের ইন্ডিকেটর। আবার অনিয়মিত বৃষ্টিপাতও হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের একটা ভয়াবহ লক্ষণ মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়া। জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে শুধু সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা নয় বরং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেকোনো জায়গায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে।

শিল্পবিপ্লবের শুরু থেকে পর্যায়ক্রমে শিল্পসভ্যতা বৃদ্ধির কারণে এখন তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। এই তাপমাত্রা বাড়ার কারণেই গ্রিনহাউস গ্যাস সৃষ্টি। মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে গ্রিনহাউস গ্যাস ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই গ্যাসগুলো যত বায়ুমণ্ডলে যায় পৃথিবীর তাপমাত্রা ততই বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ বৈশ্বিক কার্বন ও GHG নিঃসরণের পরিমাণ সারা পৃথিবীর মাত্র ০.৫৬% অংশীদার। কিন্তু জলবায়ু দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে তার স্থান সপ্তম। যেসব খাত থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস (GHG) বেশি নিঃসরণ হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে - বিদ্যুৎ, কৃষি ও বন ধ্বংস করে গড়ে ওঠা ইন্ডাস্ট্রি। কৃষি ও কার্বন

নিঃসরণের জন্যে দায়ী।

দুই দিক থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমত কৃষির বিশাল কর্মকাণ্ড জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে, অপরদিকে জলবায়ুর মন্দ পরিবর্তন কৃষিতে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কৃষি মানেই হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি উৎপাদনের ভিত্তি প্রকৃতিকেও রক্ষা করা। কৃষিকে পথ খুঁজে বের করতে হবে এমন - প্রাকৃতিক ও প্রতিবেশের দিক থেকে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রাণবৈচিত্র্য নির্ভর এবং পরিবেশ সম্মত। আবার এটাও পরিষ্কার যে, কৃষির এই পথ পরিবেশসম্মত হবে না এবং পৃথিবীর মানুষকে খাওয়াতেও পারবে না, যদি কৃষি ব্যবস্থা পরিবেশ ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে।

'বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক কৃষিকে দীর্ঘস্থায়ী গণনা করবার কোনো সুযোগ নেই' এ বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে 'দি ইন্টার ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অব এগ্রিকালচার নলেজ, সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট (IAASTD)' নামে একটি প্রতিষ্ঠান একটি সমীক্ষা করেছে তারা দাবি করে, তাদের সমীক্ষা বুঝতে হলে, বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক কৃষির প্রশ্নগুলো উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। যৌথ আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এ সমীক্ষার কাজে সহায়তায় বহু আর্থিক প্রতিষ্ঠান জড়িত ছিল। যেমন, বিশ্বব্যাংক (WB), বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), ইউ. এন. এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP), ইউ. এন. ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), ইউনেসকো (UNESCO) এবং গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (GEF) ইত্যাদি।

এইসব প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, বর্তমানে প্রচলিত কৃষিনীতি ও চর্চায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। আর সেই পরিবর্তন আনতে হবে– ক্ষুধা, দারিদ্র্য. সামাজিক সাম্যতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশসম্মত কৃষিচর্চার আলোকে। সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে– সবকিছুকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কারণে কৃষিশিল্প কারখানাতে পরিণত হয়েছে। যোগান ও শক্তি নিবিড় হওয়ার কারণে একদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করেছে, অন্যদিকে প্রান্তিক কৃষক আর নিজস্ব কৃষিতে টিকে থাকতে পারে নাই। কৃষকরা হয়েছে ভূমিহীন। কেননা সবুজ বিপ্লবে কৃষির প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্জন। এ কৃষি অত্যন্ত ব্যয়বহুল কৃষি, একদিকে এতে প্রাকৃতিক পরিবেশের মারাত্মক রকমের ক্ষতি করা হয়েছে, অপরদিকে সামাজিক অসাম্য বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অল্প যোগানে প্রাকৃতিক পরিবেশসম্মত কৃষির জায়গা সবুজ বিপ্লবের একাট্টা উচ্চ ফলনশীল জাত দখল করে নিয়েছে।

সবুজ বিপ্লব কৃষি একটি প্যাকেজ। এই কৃষির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে হাইব্রিড ও উফশী বীজ, উচ্চ যোগান, যান্ত্রিক সেচ, রাসায়নিক কীটনাশক ও রাসায়নিক সার। এই আধুনিক কৃষি যথাযথ উৎপাদন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন– শস্য প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ, রাস্তা-ঘাট, পরিবহন, মেশিনারিজ,

বাজার এবং অবকাঠামো নির্মাণ। এসব করার জন্য উচ্চ সুদে আর্থিক ঋণ সুবিধা পাবার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়ে থাকে। অপরদিকে সরকার মূল্য-সুবিধাও প্রদান করে থাকে। অর্থ্যাৎ আধুনিক কৃষি আসলে উপর থেকে জোর করে প্রবর্তন করা হয়েছে। কৃষিকে বানানো হয়েছে কারখানা।

১৯৭০ দশকে সবুজ বিপ্লবের কৃষি, লোকায়ত কৃষির স্থান দখল করে নেয়। এ সময়ের পূর্বে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোটি কোটি কৃষক লোকায়ত কৃষি পদ্ধতিকে সবুজ বিপ্লবের মতো চর্চা করেছে। ১৯৯০ সালের মধ্যে পুরো এশিয়া মহাদেশে দেখা যায় ৭৫% কৃষি নতুন জাতের উফশী বীজ দিয়ে কৃষি কাজ করেছে। দক্ষিণের দেশগুলোতে দ্রুত সম্প্রসারিত সবুজ বিপ্লবের কৃষিচর্চার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার দ্রুত বেড়ে যায়। কেননা উফশী শস্য কীটনাশক নির্ভর, যার রোগ–বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম। যেহেতু এ কৃষির একমাত্র লক্ষ্য অধিক উৎপাদন সে কারণে অধিকতর যোগান হিসাবে অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক বিষের প্রয়োজন হয়ে থাকে। রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক এবং আগাছানাশক নবায়নযোগ্য কাঁচামাল দ্বারা তৈরি করা হয় না। এ সকল দ্রব্য তৈরি করার জন্য খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস আর খনিজ দ্রব্য হিসাবে ফসফেট এবং পটাশিয়াম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সবুজ বিপ্লবের কৃষিচর্চা করতে গিয়ে এই সকল বাহিরের যোগান এবং মেশিনারি সংগ্রহ করার জন্য ছোট কৃষকরা বাধ্য হন। ফলে তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

অপরদিকে কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করার ক্ষেত্রে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিশেষ করে রাসায়নিক সার উৎপাদন করার সময় যে শক্তি ব্যয় হয় তাতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মোট যে পরিমাণ গ্রিনহাউস যোগ হয়ে থাকে তার পরিমাণ ০.৬ থেকে ১.২%। শিল্পভিত্তিক কৃষি পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে রাসায়নিক সার, রাসায়নিক বিষ আর নিবিড় কৃষি পদ্ধতি অবশ্যই মাটিকে ধ্বংস করেছে। মাটিতে কার্বনের অবস্থা খুবই জটিল অবস্থায় পৌঁছেছে। সবুজ বিপ্লবের কৃষিকাজ করার কারণে প্রাকৃতিক বন, হাওড়– বাওড় ও নদীগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। অতিরিক্ত রাসায়নিক যোগান ব্যবহারের কারণে একদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে অপরদিকে কৃষক এবং ক্রেতা সাধারণ স্বাস্থ্যগত সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া রাসায়নিক বিষের যে পরিমাণ অবশেষ মাটিতে সঞ্চিত থাকে তার কারণে পরিবেশ দূষণ হয়ে প্রাণবৈচিত্র্য সম্পদ ধ্বংস হয়। মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহার করার কারণে রাসায়নিক বিষ প্রতিরোধী কীটপতঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে, একইসাথে উপকারী প্রাণীদের ধ্বংস করা হচ্ছে।

সবুজ বিপ্লবের কারণে প্রাণবৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিব্যবস্থার স্থানে একাট্টা কৃষি (monoculture) পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। যখন সবুজ বিপ্লবের শস্য বীজ, হাইব্রিড জাতের গবাদিপশু, হাঁস- মুরগী, মাছ ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃষি কাজ করা হয় তখন কৃষক তার লোকায়ত স্থানীয় জাতগুলো এবং তার নিজস্ব জ্ঞানকে পরিত্যাগ করে। ফলে লোকায়ত স্থানীয় জাতগুলো চিরতরে হারিয়ে যায়। কিন্তু কৃষির প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখাটা দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রাণস্বরূপ। আগেকার দিনের

কৃষি অর্থ্যাৎ স্থানীয় কৃষক সমাজে একটি শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন ছিল। সেখানে কৃষকরা নিজেদের মধ্যে বীজ বিনিময় করতেন এবং তারা মুক্তভাবে জ্ঞানের আদান– প্রদান করতেন। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের কারণে সেসব চর্চার পরিবেশ এবং সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। কেননা সবুজ বিপ্লবের বীজ হচ্ছে হাইব্রিড, উফশী বীজ যা সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব নয়। সে কারণে কৃষকরা বাজার থেকে বীজ ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ কারণে পরবর্তী মৌসুমের জন্য কোনো বীজ সংরক্ষণ করে রেখে ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। এই প্রবণতা কৃষকের জন্য একটি বাড়তি খরচ ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব কারণে সামাজিক অসাম্যতা সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে নিজেদের মধ্যে অনেক দূরত্ব।

সম্প্রতি বছরগুলোতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের পদ্ধতিতে শস্য উৎপাদন সহজে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI) একটি ট্রায়াল পরিচালনা করে। এই ট্রায়ালের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে– সকল সময়ে সর্বোচ্চ উৎপাদন ধরে রাখা। সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত যোগান প্রদান করে ধানের উৎপাদন ধরে রাখা। এ ব্যাপারে সবচেয়ে দক্ষ কৃষককে দিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় ইনপুট লেবেল স্থির রাখা হয়েছিল। বাস্তবে দেখা গেল ধানের উৎপাদন কমে গেছে। একমাত্র পরিবেশসম্মত কৃষি স্থানীয়ভাবে কম খরচে উন্নত মানের পুষ্টিমানসম্পন্ন পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের সামর্থ্য রাখে। এর চাষাবাদ কৌশল এবং যোগান কোনো অবস্থায় পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে না। পরিবেশসম্মত কৃষিব্যবস্থা প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিকে অনেক কমিয়ে থাকে। জৈবকৃষির গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে– জলবায়ুর খারাপ পরিবর্তনের তীব্রতাকে প্রশমিত করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে এই কৃষিতে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের সুযোগ নেই ,কার্বনের ব্যবহার যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়। অপরদিকে আধুনিক কৃষিতে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা যথাযথ ব্যবহৃত না হয়ে মাটিতে জমা থাকে। এটা প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। প্রচলিত আধুনিক কৃষির তুলনায় জৈব কৃষি পদ্ধতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় দিক থেকে বহুগুণ ভালো এবং এর দক্ষতা অনেক বেশি।

জলবায়ুর খারাপ পরিবর্তনের দিক থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস (GHG) হিসেবে যার অবদান সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে-কার্বন গ্যাস নিঃসরণ। এক্ষেত্রে অনায়াসে প্রচলিত রাসায়নিক কৃষিপদ্ধতি বাদ দিয়ে পরিবেশসম্মত কৃষিচর্চার মাধ্যমে তা কমানো সম্ভব। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (WTO) এবং FIBL রিচার্স ইনস্টিটিউট অব অর্গানিক এগ্রিকালচার, সুইজারল্যান্ডের তত্ত্বাবধানে ২০০৭ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্গানিক কৃষি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণা কাজ থেকে যে সফল্য পাওয়া গেছে–

১. জৈবকৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার কমিয়ে ফেলা সম্ভব। রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা যায়, জমির উর্বরা শক্তি ধরে রাখা সম্ভব, লেগুম শস্য চাষাবাদের মাধ্যমে এবং শস্যের পরিত্যক্ত দ্রব্য, আচ্ছাদন শস্য ব্যবহার করে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

২. জৈবকৃষি পদ্ধতিতে মাটি উর্বরা শক্তি অর্জন করে, মাটিতে কার্বন যথাযথ ব্যবহার হয়ে থাকে।

৩.মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা মাটির অত্যাধিক উষ্ণতাকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রাখে এবং অতিরিক্ত কার্বনকে শস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে রাখে ফলে জলবায়ুর খারাপ পরিবর্তন হবার কোনো সুযোগ সৃষ্টি হয় না। জৈবকৃষি পদ্ধতিতে কার্বন কিভাবে মাটিতে ফেরত আসবে সেটি নিশ্চিত করে।

৪. পরিবেশসম্মত জৈবকৃষি, কৃষি বনায়নে গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক অবদান রাখতে পারে।

৫. কৃষকের লোকায়ত জ্ঞান, দক্ষতা, মাটি তৈরির কৌশল অতি উচ্চমানসম্পন্ন প্রাণসম্পদ ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের সাহায্যে পরিবেশসম্মত কৃষিচর্চার মাধ্যমে জলবায়ুর খারাপ পরিবর্তন শক্তিশালীভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব।

এই গবেষণার সারমর্ম এমন- কৃষি তথা জৈবকৃষি জলবায়ুর খারাপ পরিবর্তন উপশম এবং মোকাবেলার দিক থেকে অত্যন্ত ভালো অবস্থানে রয়েছে। কেননা এ পদ্ধতিতে দক্ষতার সাথে মাটির টপ সয়েলকে ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ করা হয়, মাটিতে জৈববস্তু প্রতিস্থাপন করা যায়, মাটির উর্বরা শক্তি এবং পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়ে থাকে এবং অল্প এবং মধ্যম যোগান দিয়েই উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, একই সাথে কৃষকের ক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতির কৃষিকাজ চর্চা করার কারণে বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে বহু পরিমাণে প্রশমন করা সম্ভব হয়ে থাকে। মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব উপাদান থাকলে একদিকে শস্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। কৃষক যখন জলবায়ুর তারতম্য লক্ষ্য করবেন, তখন তিনি পরিবেশসম্মত জৈবকৃষি চর্চার মাধ্যমে অনায়াসে তা মোকাবেলা করতে সমর্থ হবেন। তারা কৃষি প্রাকৃতিক পরিবেশচর্চার সাহায্যে প্রাণবৈচিত্র্য সম্পদ রক্ষা করেন; উন্নত মাটি ব্যবস্থাপনা, শক্তিশালী সামাজিক লোকায়ত জ্ঞান ব্যবহার করে মানসম্পন্ন এবং দক্ষভাবে পানি ব্যবহার পদ্ধতিকে শক্তিশালী করে পরিবেশসম্মত জৈব কৃষির সাহায্যে অনায়াসে জলবায়ুর খারাপ পরিবর্তনকে মোকাবেলা করার সামর্থ্য রাখে। পরিবেশসম্মত জৈবকৃষির আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে– মাটির পূর্বের উর্বরা শক্তিকেও ধরে রাখে, মাটি খরা ও ঠাণ্ডাকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন যথাযথ রাখে।

জলবায়ু দুর্যোগের কারণে যেসব প্রভাব কৃষির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে প্রথমত খরা দ্বিতীয়ত বন্যা। আরও আছে অতিবৃষ্টি , অনাবৃষ্টি ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া। ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার কারণে (৫০ সেমি) দেশের ১১% অংশ বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার কারণে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষকে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে অর্থাৎ উদ্বাস্ত হবে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ ৩২% উৎপাদন কমে যাবে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার যথাসম্ভব কমাতে হবে এবং কৃষি হতে হবে পরিবেশসম্মত।

এটা সুস্পষ্ট যে, পদ্ধতিগতভাবে নতুন দিকনির্দেশনায় পরিবেশসম্মত জৈব কৃষিতে বিনিয়োগ, মূলধন, যোগান এবং নীতিনির্ধারণী পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় হাজির হয়েছে। পরিবেশসম্মত জৈবকৃষি খাদ্যশস্য উৎপাদনে অবদান রাখতে পারে এবং গ্রামীণ জীবন– জীবিকার মঙ্গল সাধন করে থাকে। পরিবেশসম্মত জৈবকৃষির মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে– একজন কৃষক থেকে আরেকজন কৃষক শেখে, অভিজ্ঞতা বিনিময় করে, একে– অপরকে উৎসাহ দেয়। পরিবেশসম্মত জৈবকৃষির জন্য প্রধানতম প্রয়োজন কৃষক নির্ভর কৃষিনীতি ও তার চর্চার। তাহলেই পরিবেশসম্মত জৈবকৃষি শক্তিশালী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

তথ্যসূত্র :

গরম জলবায়ু ও গরম রাজনীতি-ফরিদা আক্তার – আগামী প্রকাশনী, ২০২৫
সাপ্তাহিক চিন্তা (বিশেষ সংখ্যা-জলবায়ু বিপর্যয়) – ৬ নভেম্বর ২০২৫

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন

দেবদাস বাড়ই
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

ভূমিকা

সুন্দরবন প্রকৃতির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। নদী, সাগর, কাদা, জোয়ার-ভাটা ও ঘন সবুজ অরণ্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই অঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এর প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়, পরিবর্তনশীল এবং প্রাণবন্ত। এখানে প্রকৃতি প্রতিনিয়ত রূপ বদলায়– কখনো শান্ত, কখনো ভয়ংকর, কখনো রহস্যময়।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

সুন্দরবন গঙ্গা–ব্রহ্মপুত্র–মেঘনা বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত। অসংখ্য নদী, খাল ও শাখানদী এ বনভূমিকে জালেরমতো ঘিরে রেখেছে। জোয়ার-ভাটার প্রভাবে প্রতিদিন দুইবার বনভূমির অনেক অংশ পানিতে প্লাবিত হয়। এখানকার মাটি নরম পলিমাটি ও কাদাময়। লবণাক্ততার তারতম্যের কারণে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ জন্মে। পূর্বদিকে তুলনামূলক কম লবণাক্ততা, পশ্চিমদিকে বেশি লবণাক্ত পরিবেশ দেখা যায়।

জলবায়ু ও ঋতুচক্র

সুন্দরবনের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র।

- গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশি এবং আর্দ্রতা উচ্চ।
- বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
- শীতকালে আবহাওয়া তুলনামূলক শীতল ও শুষ্ক।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এ অঞ্চলের প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপকূলীয় অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানে প্রায়ই আঘাত হানে।

ম্যানগ্রোভ অরণ্যের স্বরূপ :

সুন্দরবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদরাজি। সুন্দরী, গরান, গেওয়া, পশুর ও গোলপাতা গাছ এখানে বেশি দেখা যায়। ম্যানগ্রোভ গাছের শ্বাসমূল মাটির ওপর উঠে থাকে, যা কাদামাটির ভেতরে অক্সিজেনের অভাব পূরণ করে। লবণাক্ত পরিবেশে টিকে থাকার জন্য এসব গাছের বিশেষ অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে।

জীবজগতের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক

সুন্দরবনের প্রকৃতি প্রাণিকুলের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এখানে বাস করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, যা এই অরণ্যের প্রতীক। এছাড়া হরিণ, বানর, কুমির, নানা প্রজাতির পাখি ও মাছ এই পরিবেশের অংশ। গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তুতন্ত্র, যেখানে প্রতিটি উপাদান একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

সুন্দরবনের প্রকৃতির সৌন্দর্য অনন্য।

- সূর্যোদয়ে নদীর জলে লাল আভা
- কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল
- জোয়ারের সময় গাছের গোড়া ডুবে থাকা দৃশ্য
- নীরবতার মাঝে পাখির ডাক

এই সব মিলিয়ে সুন্দরবন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারী।

প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ

যদিও সুন্দরবন প্রকৃতির এক অনন্য উদাহরণ, তবুও এটি নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন–

- জলবায়ু পরিবর্তন
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি
- অতিরিক্ত লবণাক্ততা
- ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ

এই পরিবর্তনগুলো বনটির প্রাকৃতিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলছে।

উপসংহার

সুন্দরবনের প্রকৃতি এক জীবন্ত চিত্রপট, যেখানে স্থল ও জল, গাছ ও প্রাণী, জোয়ার ও ভাটা মিলেমিশে তৈরি করেছে এক অনন্য পরিবেশ। এটি শুধু একটি বন নয়, বরং এক চলমান, পরিবর্তনশীল এবং সমন্বিত প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। সুন্দরবনের প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানে আমাদের পরিবেশ, উপকূল ও ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা।

ফিরে দেখা আন্ধারমানিক

পাপিয়া হালদার
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য আর সম্পদের মিলনমেলা বাংলাদেশের সর্বশেষ দক্ষিণের উপজেলা মোংলা। আমাদের জীবন জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এই দুই সম্পদ, পশুর নদী আর সুন্দরবন। প্রাকৃতিক এই সম্পদের উপর নির্ভরশীল এই অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ। আমরা আজও জানিনা এই সম্পদের মূল্য কত! আর কীভাবে এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে নিজেদের জীবনকে সুরক্ষিত ও সুন্দর রাখতে পারি। আবার কখনো এই সৌন্দর্য, সম্পদ আমাদের জীবনে দূর্যোগের কারণ হয়ে ওঠে। এরই মাঝে আমাদের বেঁচে থাকা, আমাদের পথ চলা, আনন্দ, বেদনা সবই মিশে আছে এই চোখের জলের মতো নোনাজলের সাথে। তবু এই নোনাজলের মাঝেই হৃদয়ের গভীর আনন্দ লুকিয়ে থাকে তেমনই এক আনন্দঘন পরিবেশে আমরা বরাবরের মতোই এবারও কলেজের শিক্ষিত কর্মচারী মিলে একটা দিনের জন্য ঘুরতে যাবো। সে কারণে মনের মধ্যে একটা অন্যরকম ভালোলাগা কাজ করছে।

কুয়াশার চাঁদরে মোড়া শীতের ছুটির সকাল। অন্য কোনো দিনের তুলনায় আজ একটু তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা। যদিও শরীরে কোনো ক্লান্তি নেই। মনে একটা অন্যরকম আনন্দের অনুভূতি কাজ করছে ভিতরে ভিতরে। হয়তো মন আজ শরীরকে শাসন করছে। আর সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। কয়েকজন সহকর্মীর সাথে সকাল আটটায় বাসা থেকে বের হয়ে বিশ মিনিট পায়ে হেঁটেই পৌঁছে গেলাম লঞ্চ ঘাটে। একটু দেরি করে সকাল নয়টা আমাদের লঞ্চটি তরঙ্গের সাথে তাল মিলিয়ে আপন গতিতে যাত্রা শুরু করলো আমাদের গন্তব্য স্থানের দিকে। শীতের সকাল সে কারণে পশুর নদীর রূপটাও অন্যরকম। বর্ষার পশুর নদী মনে হয় দামাল ছেলের মতো প্রস্ফুটিত, উন্মাদনায় জীবন্ত। আজ শীতের সকালে নদীটাকে মনে হচ্ছে ক্লান্ত পথিক। যে নদী বর্ষার দুকূল প্লাবিত করে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সহায় সম্বলহীন মাথাগোজার শেষ ঠিকানা। সেই নদী যেন আজ স্তব্দ, ডুকরে কান্না করা বোবা মানুষ। প্রকৃতির এমন রূপ যেনো জীবনের ছবি আঁকা।

আমাদের লঞ্চ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে। আর মনের ভীতর একে একে ভেসে আসছে যে এই নদীর পথে কতো সহস্রাব্দ ধরে কতো মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বয়ে এনেছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, দেশ বিদেশের দ্রব্য সামগ্রী ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা। যার অনেক কিছু আজ বাংলার লোকসংস্কৃতির সাথে মিশে গেছে এবং সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির নিত্যনতুন রূপ। পৃথিবীর

বিভিন্ন দেশে নদীই ছিল একসময় মানুষের বসতি স্থাপনের প্রধান কেন্দ্র। বিভিন্ন দেশের বড় বড় নদীর তীরে যেমন গড়ে উঠেছে প্রাচীন সব সভ্যতা ঠিক তেমনি পশুর নদীর তীরে গড়ে ওঠা মোংলা সমুদ্র বন্দর। এই অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের একমাত্র অবলম্বন। নদী যেনো জীবন প্রবাহের আর এক নাম। সেজন্যই হয়তো বাংলার গান, কবিতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রে নদী মিলে মিশে হয়ে উঠেছে নদীমাতৃক বাংলাদেশ। আমি গর্বিত যে সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা নদীমাতৃক সোনার বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ব্যবসায়ী, নাবিক ও পর্যটক এসেছেন এই বাংলায়। তাদের হাত ধরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কখনোবা শাসন শোষণ ও নির্যাতনে গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলের জীবন ও জনপদ। ভাবতে ভাবতে কখন যে অনেকটা পথ চলে এসেছি বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ চোখে পড়ে নারী পুরুষ মিলে জীবিকার অন্বেষণে নদীর বুকে ভেসে চলা ছোট ছোট নৌকা করে মাছ ধরার দৃশ্য। ঝড়, বৃষ্টি, রোদ সবকিছু উপেক্ষা করে খোলা আকাশের নিচে সারা বছর মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। হাসি আনন্দে মিলে একাকার হয়ে আছে তাদের জীবন। চলার পথটা বড়ই বৈচিত্র্যময়। একদিকে বিস্তীর্ণ সবুজ সুন্দরবন ও অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের বিশালতা। পশুর নদী বয়ে গেছে মাঝখান দিয়ে। নদী যেন প্রকৃতির দুই রূপের সেতু বন্ধন করে আছে। এমনি করে কখন যে সময় চলে গেছে বুঝতেই পারিনি। সবাই আনন্দে চিৎকার করে বললাম যে আমরা "আন্ধারমানিক" ঘাঁটে পৌঁছে গেছি। আন্ধারমানিক নদীর পাড়েই গড়ে উঠেছে এই পর্যটন কেন্দ্র।

সবাই মিলে যে যার মতো দল বেঁধে এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি শুরু হয়ে যায়। কয়েকটা শান্ত স্বভাবের হরিণ চোখে পড়ে এখানের খোয়াড়ের মাঝে। তাদের মায়াবি চোখের অপলক দৃষ্টিতে নীরব আর্তনাদ যে আমাদের যেতে দাও। বন্যেরাই বনে সুন্দর। আর বাঘের পায়ের ছাপ দেখেই বোঝা গেল বনের রাজার দেখা না পাওয়াই ভালো। নিজের মনের মাধুরী মিশায়ে বানরগুলো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। হয়তো মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে যদি কেউ কোনো খাবার দেয় সেই অপেক্ষায়। এরই মাঝে আমাদের খাবারের পালা শুরু হলো আবার শেষ ও হলো। অনেক লম্বা পাঁয়ে হাঁটা পথ দিয়ে বনের ভিতরের দিকটা গেলাম আমরা। মনে হয় এখানে কোনো গভীর বন ছিলো একদিন। আজ তার অবশিষ্টটুকু রয়েছে মাত্র। দেখতে দেখতে দু-তিন ঘণ্টা চলে গেলো। নদীর পশ্চিম তীর থেকে বিকেলের স্নিগ্ধ আলো গাছের ডালে এসে পড়েছে। কি অপরূপ দৃশ্য। আর সেই সাথে মনে পড়ছে আমাদের ফিরতে হবে। এই ভেবে মনটা কেন যেন একটু খারাপ হয়ে গেল।

চার দেয়ালের মাঝে থাকতে থাকতে দূরে কোথাও গেলে কার না ভালো লাগে। এ যেন মুক্তির স্বাদ, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেওয়ার শান্তি। চিরসবুজ এই বন যেন প্রাণের স্পন্দন। কতোবার এই সুন্দরবনের জন্য আমরা বেঁচে গেছি প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে। অথচ আমরা এই প্রাকৃতিক সম্পদের কোন যত্ন নেই না। বনের কোনো রক্ষণাবেক্ষণ নেই। মানুষ অকাতরে গাছ কাঁটছে। বনের পশুদের মেরে ফেলছে। দেখার কেউ থেকেও নেই। এমনি করে সময়টা যে কখন কেটে গেল বুজতেই পারিনি। হঠাৎ শুনতে পেলাম, সবাই ঘাঁটে এসো, ফিরতে হবে! খুব মন খারাপ হয়ে গেল। নদীর

স্রোতের টানে এবার আমাদের ভেসে চলার পালা। কেমন যেন একটা ভয় ভিতরে ভিতরে কাজ করছে মাঝে মাঝেই।

এই তো সেদিন পর্যটকদের আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছিল। জীবন যেন কোথাও শঙ্কামুক্ত নয়। এই নদী আর বনের মাঝেই কত মানুষের জীবনের গল্প লুকিয়ে আছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, বন্দী খাঁচার বাইরে এসে চলছে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। জীবনের এই দ্বন্দ্ব আমি বুঝি না। অর্ধশত বছর পেরিয়ে আজ ও জীবনের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া হলো না। ইঁদুর দৌড়ের এই যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কেমন যেন আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি সংসার নামের এই জেলখানায়। এখান থেকে পালাবার পথ নেই। জলের স্রোতে ভেসে চলছে আমাদের ছোট্ট লঞ্চ তখন মনের জানালায় ভেসে উঠলো...

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত গান–
"বেলা বয়ে যায়
ছোট্ট মোদের পানসি তরি
সঙ্গে কে কে যাবি আয়
বেলা বয়ে যায়..."

নোনা জলের রূপকথা

নিগার সুলতানা সুমী
প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

সবুজ অরণ্যের বুক চিরে বয়ে যাওয়া সুন্দরবনের খালগুলো যেন একেকটি জীবন্ত আয়না। আর সেই আয়নাগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক বিস্ময়কর জগৎ। সুন্দরবনের কথা উঠলেই আমাদের মানসপটে বাঘের গর্জন কিংবা হরিণের পলায়নপর চপলতা ভেসে ওঠে। কিন্তু বনের আয়নাসদৃশ শিরা উপশিরাগুলো, ভেতরে নোনাজলের গভীরে যে জগৎ রয়েছে তার খবর আমরা রাখি না। বর্তমানে এই আয়নাগুলো ভেঙে যাওয়ার উপক্রম, ময়লা- আবর্জনা, ভূমি দখলে খালগুলো সত্যিই রূপকথা হয়ে উঠেছে। নোনাজলে পরিপূর্ণ এক আয়নার পাশে বসবাস করার সুযোগ হওয়ায় সেখানকার অদ্ভুত দৃশ্য দেখার সুযোগ হয়েছিল, যা এখন রূপকথার মতো মনে হয়। আজ তেমনই কিছু জীবন্ত চরিত্র নিয়ে লিখছি যারা এখন বিলুপ্তির পথে।

জোয়ার-ভাটার ছন্দে প্রতিদিন রচিত হয় নতুন নতুন উপাখ্যান। সুন্দরবনের খালের বাঁকে সূর্য যখন নোনা পানিতে আছড়ে পড়ে তখন হঠাৎ এক অলৌকিক দৃশ্য দেখা যায়। কোনো রূপকথার মায়ার মতো অগুনতি গোলাপি-নীলাভ আলোর বিন্দু ভেসে চলেছে, স্রোতের টানে, এরা কোনো মাছ নয়, লতাও নয়, এরা নোনা জলের এক ক্ষণস্থায়ী বিস্ময়। যেন সমুদ্রের তলদেশ হতে উঠে আসা কোনো জীবন্ত নীলকান্তমণি। কোনো পাখনা নেই, গর্জন নেই, নিছক একদল পোকার মতো প্রাণীর এই পথচলা প্রকৃতির এক গোপন সংকেত।

সুন্দরবনের জেলেরা বা স্থানীয়রা এদের 'পানপোকা', সোনাপুই বা লোনা কেঁচো বলে চেনে। প্রাণীটি মূলত রিবন ওয়ার্স বা লিসর্টিন-এর একটি বিশেষ প্রজাতি। ছোটবেলায় আমরা বলতাম ইলিশ মাছের পোকা। নোনা পানিতে আলোর প্রতিফলনে এদের শরীর থেকে গোলাপি আর নীলাভ রঙের এক অপার্থিব দ্যুতি বের হতো। এরা দল বেঁধে জোয়ারে আসত, লাঠি দিয়ে ডাঙায় তুলতেই অভিমানে দুইভাগ হয়ে পড়ে যেতো। তুষারের মত গলে যায় কেবল পেশী ও এক ধরনের পিচ্ছিল রস দিয়ে এদের দেহ গঠিত। এদের উজ্জ্বলতা কোনো কৃত্রিম আলোর চেয়েও সুন্দর, যেনো নোনা পানির আলোকবর্তিকা। দূর হতে দেখলে মনে হয় যেন আকাশের নক্ষত্রেরা ভুল করে নোনা জলে ছিটকে পড়েছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য ছোঁয়ার জন্য নয়, কিছু সৌন্দর্য কেবল মুগ্ধ হয়ে দেখার জন্য।

রহস্যময় আর একটি রূপকথার নায়ক হলো– 'সাভলবস্টার' যাকে এখন দেখা যায় না বললেই চলে। কাঁকড়া ও চিংড়ির মেলবন্ধনে তৈরি এই প্রাণীটি মাটির নিচেয় অনেক গভীরে (প্রায় ৪-৮ ফুট) গর্ত করে বাস করে। মাটি খুঁড়ে বাইরে কাদার স্তুপ করে রাখে। যা দেখতে আগ্নেয়গিরির মতো মনে হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে কাদা বিচ্ছু নামে পরিচিত। এরা ম্যানগ্রোভ বনের ইকোসিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরিচিত। মাটি খুঁড়ে গর্ত তৈরির ফলে মাটির নিচে অক্সিজেন পৌঁছাতে সাহায্য করে। এদের উপরে তোলা মাটি আঠালো ও ময়লামুক্ত হওয়ায় উপকূলের মানুষ চুলা বানাতে এ কাদার ব্যবহার করে। এক সময় বাঙালির উঠানে এদের প্রচুর বিচরণ ছিলো।

এরপর রয়েছে সেই অদ্ভুত জীব-মাডস্কিপার, স্থানীয়রা একে ডাহুক মাছ বা লোনা মাছ হিসেবে চেনে। সারা গায়ে কাদামাখা ছোট এ মাছগুলো বুক দিয়ে লাফিয়ে চলে বা হামাগুড়ি দেয়। ছাই রঙের দেহে কালোবর্ণের ছাপা বিশিষ্ট চেহারা। যদিও এ মাছ মানুষ খায় না। সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থানে এরা খুব সাধারণ কিন্তু রসহ্যময় প্রাণী।

সুন্দরবনের খালের কিনারে রয়েছে সবুজ সংসার। খালের দুই পাড়ে গোলপাতা বা সুন্দর গাছই নয় রয়েছে টকফলের সমাহার, কেওড়া ও ওড়া ফল, রয়েছে হরেক রকম ঝোপঝাড়। সেখানে দেখা যায় কণ্টকাকীর্ণ হরগোজা, জালের মতো বিছানো– এই গাছটার শিকড় মাটির ক্ষয়রোধ করে। চিকিৎসা শাস্ত্রে এ গাছের মূল ও পাতা ব্যবহার হয়। হরগোজার বেগুনীফুল নির্জনতায় এক অন্যরকম আভা ছড়ায়। সুন্দরবনের রানির মতো সেজে থাকে নোনারাজ্যে। এর পাশেই থাকে আসামলতার ঘন জাল। নোনাজল সেখানে পৌঁছায় না, সেখানে দেখা মেলে নাকফুল ও বনলেবুর ঝোপ। বনলেবু দেখতে গোল লেবুর মত ও টক স্বাদযুক্ত।

জোয়ারের নোনাজল যখন বনের ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন ওরাধান (বুনোধান) ক্ষেতের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া স্রোতে ক্ষুদ্র প্রাণীরা লুকোচুরি খেলায় মেতে ওঠে। গাছের ডালে ডালে পরগাছার মতো জড়িয়ে থাকে সোনালি রঙের স্বর্ণলতা আর জঙ্গলকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা বাওয়ালি লতা। সুন্দরবনের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী এবং নাম না জানা আগাছাগুলোই যেন প্রকৃতির সত্যিকারের কারিগর। আমরা যখন বাঘ হরিণ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তখন এই হরগোজার ঝোপের আড়ালে কিংবা ওরাধানের ক্ষেতের শান্ত স্রোতে নিঃশব্দ বয়ে চলে এক বিশাল জীবনচক্র। ছোঁয়ামাত্রই নিমেষে গলে যাওয়া গোলাপি-নীলাভ পোকাগুলো আমাদের শিখিয়ে যায় যে সৌন্দর্য বড়ই ভঙ্গুর। যাদের শুধু জলের স্রোতেই মানায়, ডাঙার রুক্ষতায় তারা কেবল এক ফোটা অশ্রুবিন্দু হয়ে বিলীন হয়ে যায়। প্রকৃতির এই রহস্যময় রূপকথা টিকে থাকুক তার আপন মহিমায়, নোনা জলের অতল গহ্বরে। মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতিটি ক্ষুদ্র সৃষ্টিই অসামান্য এবং তাদের প্রত্যেকেরই এই বিশাল বনের অস্তিত্ব রক্ষায় নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে।

সুন্দরবনের কাদামাটির লাল সৈনিক

মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনন্য নিদর্শন হলো সুন্দরবন। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এবং জীববৈচিত্র্যের এক অপূর্ব সম্ভার। এ বনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, কুমির এবং বিভিন্ন ধরনের পাখির পাশাপাশি আর একটি আকর্ষণীয় প্রাণী হলো লাল কাঁকড়া। সুন্দরবনের ছোট কিন্তু দৃষ্টিনন্দন প্রাণীদের মধ্যে লাল কাঁকড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুন্দরবনের কাঁকড়া

সুন্দরবনে প্রায় ১৪ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়, যার মধ্যে কাদা কাঁকড়া সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এখানে শিলা কাঁকড়া, রাজ কাঁকড়া, ফিডলার কাঁকড়া, হার্মিট কাঁকড়া, লাল কাঁকড়া, হাব্বা কাঁকড়া, সেটরা কাঁকড়া, ঘোস্ট কাঁকড়া-সহ বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়া বসবাস করে।

সুন্দরবনের লাল কাঁকড়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য

আবাস ও পরিবেশ

সুন্দরবনের মোহনা, কাদামাটি ও বালুকাময় এলাকায় এদের বেশি দেখা যায়। নদী, খাল ও সমুদ্রতটে জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে এদের বেশি দেখা যায়। বিশেষকরে কাদার মধ্যে এরা গর্ত করে বসবাস করে।

আচরণ ও খাদ্য

এরা অত্যন্ত দ্রুতগতির প্রাণী। বিপদের আভাস পেলে দ্রুত গর্তে লুকিয়ে পড়ে। রাতে এরা বেশি সক্রিয় থাকে এবং দিনের বেলায় বালুতে বা কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এরা সর্বভুক-ছোট জলজ প্রাণী, মৃতজীব, উদ্ভিদ ও প্লাংকটন খেয়ে বেঁচে থাকে।

প্রজনন ও জীবনচক্র

স্ত্রী কাঁকড়া ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটে ছোট কাঁকড়ার জন্ম হয়। বাচ্চাগুলো ধীরে ধীরে বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ কাঁকড়ায় পরিণত হয়।

পরিবেশগত গুরুত্ব

সুন্দরবনের লাল কাঁকড়া ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম প্রধান "ইকোসিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার" যা জোয়ার ভাটা অঞ্চলের মাটি বায়ুযুক্ত করে এবং পুষ্টিচক্র বজায় রাখে। এরা বালুকাময় বা কাদাচরে গর্ত করে বাস করে এবং অনুজীবসহ পচা জৈব পদার্থ খেয়ে বনের মেঝে পরিষ্কার রাখে। এদের উজ্জ্বল লাল রঙ ম্যানগ্রোভের জীববৈচিত্র্যের এক অনন্য নিদর্শন। বস্তুত সুন্দরবনের লাল কাঁকড়া ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মাটি সুষমীকরণ, পুষ্টি উপাদান আবর্তন, বনের পরিছন্নতা রক্ষা ও পর্যটকদের দৃষ্টিনন্দন করে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

সুন্দবনের লাল কাঁকড়া ও অন্যান্য প্রজাতির (যেমন-মাড ক্র্যাব) এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এটি উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার প্রধান উৎস। কাঁকড়া ধরা, আহরণ ও বিপণনে স্থানীয় পর্যায়ে অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে।

সুন্দরবনের লাল কাঁকড়া সংরক্ষণে বন বিভাগের পদক্ষেপ

সুন্দরবনের লাল কাঁকড়া ও প্রজাতির প্রাকৃতিক প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বনবিভাগ প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ২৮/২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা দুই মাস সুন্দরবনের নদী-খালে কাঁকড়া ধরা নিষিদ্ধ করে। এ সময় কাঁকড়া আহরণ, পরিবহন ও বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এ সময়টা মূলত কাঁকড়া প্রজননের মৌসুম। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কাঁকড়া আহরণ বা পরিবহনকারীদের বিরুদ্ধে বন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রজনন মৌসুমে জেলেদের বিকল্প জীবিকা সন্ধানে উৎসাহিত করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

উপসংহার

সুন্দরবনের লাল কাঁকড়া প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টি। এই প্রাণী সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তাই আমাদের উচিৎ সুন্দরবন ও এর প্রাণীদেরকে রক্ষা করা।

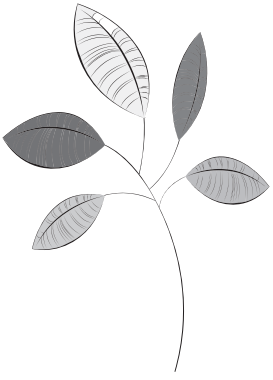

রহস্যময় বঙ্গোপসাগর

বীনা বিশ্বাস
প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

"সমুদ্র সবসময় বলে–
থেমে থেক না,
এগিয়ে যাও।"

সাগর, মহাসাগর, উপসাগর হচ্ছে মহাদেশের উপকূলভাগে অবস্থিত বিশাল জলরাশি। এই সাগর, মহাসাগর, উপসাগর হলো পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ মোট পানির প্রধান আধার যা বারিমণ্ডল নামে পরিচিত। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে পৃথিবীর মোট পানির মাত্র ৩ ভাগ স্বাদু পানি এবং ৯৭ ভাগ লবণাক্ত পানি বা সামুদ্রিক পানি যা পান করা ও ফসলের জন্য অনুপযোগী। তেমনই এক বিশাল পানির আধার বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর।

ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে ৫° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২২° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯৫° পূর্ব দ্রঘিমাংশের মধ্যে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরের আয়তন প্রায় ২২ লাখ বর্গকিলোমিটার। এই উপসাগরের উত্তাল ঢেউয়ের সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ।

পৃথিবীতে এমন কিছু স্থান রয়েছে যা এখনো রহস্যে ঘেরা। এমনই এক রহস্যময় স্থান বঙ্গোপসাগরের তলদেশ। বাংলাদেশের দক্ষিণে সুন্দরবনের অদূরে বঙ্গোপসাগরে লুকিয়ে রয়েছে এক রহস্যময় স্থান যার নাম "সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড" বাংলায় যাকে বলে অতলস্পর্শী। এটি শুধু এক প্রাকৃতিক বিস্ময়ই নয়, পরিবেশ বিজ্ঞানীদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্রও বটে। কিন্তু কী এমন রয়েছে প্রকৃতির মাঝে লুকিয়ে থাকা এই রহস্যময় স্থানে?

"সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড" অর্থ যার কোনো তল নেই। স্থানীয় জেলেরা আবার এটির নাম দিয়েছেন "নাইবাম" অর্থাৎ এটির গভীরতা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারনাই নেই।

গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের অববাহিকায় এই গভীর খাতটি গঙ্গাখাত নামেও পরিচিত। পদ্মা, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও তাদের অসংখ্য শাখা নদীর স্রোতধারা বঙ্গোপসাগরে

পতিত হওয়ার ফলে প্রতিবছর এর দক্ষিণাংশে পলি জমে নতুন নতুন মহীসোপান এলাকা গঠন করেছে। তবে এর প্রত্যেকটি নাম যেমন রহস্যময়, এর পিছনের গল্পটাও তেমন আকর্ষণীয় ও গা ছমছমে।

১৮৬৩ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশদের একটি যুদ্ধজাহাজ এই এলাকায় এসে আকস্মিকভাবে ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। জাহাজটি ছিল গ্যাডফ্লাই নামে ২১২ টন ওজন বিশিষ্ট একটি গানবোট। এটি ভারত থেকে ইংল্যান্ডে বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন বহন করে যাচ্ছিল। যার খোঁজে এসেছিল ইংল্যান্ডের আরও কয়েকটি জাহাজ। কিন্তু জরিপ চালিয়ে ব্যর্থ হয় তারা। দেখা গেল জাহাজটির কোনো চিহ্নই খুঁজে পওয়া যায়নি। তারপর থেকে এই স্থানটির নাম দেওয়া হয় "সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড"।

প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর খাত "ম্যারিয়ানা ট্রেন্স" এর মতো এই খাতটিকে ২০১৪ সালে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রহস্যময় এই খাতটি সুন্দরবনের দুবলারচর থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নীল জলরাশির বিস্তীর্ণ গভীর এই খাতটির গভীরতা গড়ে প্রায় ১২০০ মিটার এবং সর্বোচ্চ গভীরতা প্রায় ১৩৪০ মিটার। এটি সমুদ্রে নিমজ্জিত বিশ্বের গভীরতম ১১টি গিরিখাত বা সাবমেরিন ক্যানিয়নগুলোর একটি।

"সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড" শুধুমাত্র গভীরতার জন্য বিখ্যাত নয়। জেলেদের কাছে এটি পৃথিবীর অন্যতম মাছের ভাণ্ডার হিসেবেও পরিচিত। এছাড়া এটি বিরল প্রজাতির জীববৈচিত্র্যের জন্যও অন্যতম। এটি শুধু পরিবেশ বিজ্ঞানীদের জন্য নয়, সাধারণ মানুষের কাছেও 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড'-এর রহস্য এক অনন্য রোমাঞ্চের উৎস। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ ভাণ্ডার।

এছাড়া সমুদ্রবিজ্ঞানীদের মতে 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' একটি সামুদ্রিক অভয়ারণ্য। সামুদ্রিক রহস্যময় জীবজগতের মধ্যে এখানে দেখতে পাওয়া যায় প্রায় দশ হাজার প্রজাতির পাখি, ত্রিশ হাজার প্রজাতির মাছ-সহ আরও নানা জাতের প্রাণী। নানা প্রজাতির মাছের পাশাপাশি এখানে আছে বিশাল তিমি, ডলফিন, হাঙর, কচ্ছপ এবং বিরল প্রজাতির কিছু জলজ প্রাণী। এ স্থানটি তাদের জন্য নিরাপদ প্রজননকেন্দ্র।

এটি পৃথিবীর একমাত্র সোয়াচ যেখানে তিন প্রজাতির সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী একসাথে বসবাস করে। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির তিমি, শুশুক ছাড়াও আছে পৃথিবীর বৃহত্তম ইরাবতী ডলফিন, গোলাপি পিঠের কুজো ইন্দোপ্যাসিফিক ডলফিন ও মসৃণ পিঠের পাখাবিহীন ইমপ্লাইচ ডলফিন। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক মাছের ভেতরে এখানে এ পর্যন্ত ৭৬ প্রজাতির মাছ ও ৫৩ প্রজাতির চিংড়ি জাতীয় সামুদ্রিক জীব সনাক্ত করা হয়েছে। আরও আছে বিভিন্ন প্রজাতির ঝিনুক–শঙ্খ জাতীয় প্রাণী ও কাঁকড়া প্রজাতি। এদের উপস্থিতি যে-কোনো মানুষকে মুগ্ধ করে।

বঙ্গোপসাগরের তলদেশে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও সামুদ্রিক আগাছা পাওয়া যায় যা বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ইকোসিস্টেম ও ব্লু–ইকোনমির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর তলদেশের প্রধান উদ্ভিদগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক আগাছা, শৈবাল এবং অগভীর উপকূলীয় অঞ্চলের সি-গ্রাস বা

সামুদ্রিক ঘাস ও ফাইটোপ্লাঙ্কটন। যদিও এগুলোর কিছু আনুবীক্ষণিক কিন্তু সাগরের উপরিভাগ থেকে এর তলদেশ পর্যন্ত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এই উদ্ভিদগুলো সামুদ্রিক প্রাণীর খাদ্যের মূল উৎস।

সমুদ্রবিজ্ঞানীদের ধারণা অতি মূল্যবান খনিজসম্পদ ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বাংলাদেশের অগভীর ও গভীর সমুদ্রের তলদেশে। ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশের সমুদ্রভাগে বড় ধরনের গ্যাসের মজুদ রয়েছে। এছাড়া আরও অতি মূল্যবান সব খনিজসম্পদ বঙ্গোপসাগরের তলদেশে রহস্যজনকভাবে লুকিয়ে রয়েছে।

তাইতো ভ্রমণপিপাসু বাঙালিদের সমুদ্র ভ্রমণে উৎসাহ বা আগ্রহের কমতি নেই। তবে এই স্থানটিতে যাওয়া কিন্তু একেবারেই সহজ নয়। সর্বপ্রথম খেয়াল রাখতে হবে আবহাওয়া কেমন সে বিষয়ে। সমুদ্র শান্ত থাকলেই শুরু হবে যাত্রা। যাওয়ার বাহনও হতে হবে গভীর সমুদ্রে ভ্রমণোপযোগী। এখানে যাওয়ার জন্য খুলনা বা বাগেরহাট থেকে যাত্রা শুরু করা ভালো। এখান থেকে ট্রলার অথবা লঞ্চ ভাড়া করা যেতে পারে। গ্রুপ বড় হলে বিআইডব্লিউটিসি'র সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। তবে বলা যায়, বঙ্গোপসাগরের এই রহস্যময় স্থান হবে আগামী দিনের ভ্রমণ গন্তব্য।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ এক নতুন সম্ভাবনার উৎস হলেও সমুদ্রগবেষণায় সীমাবদ্ধতা ও অনগ্রসরতার কারণে এখনো সোয়াচটির সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এটি নিয়ে গবেষণাও হয়েছে সীমিত পর্যায়ের। ব্যাপক গবেষণা চালালে হয়তো অনেক কিছুই পাওয়া যাবে এখানে।

দেশের পর্যটন খাত, ভূমি ইকোনমি কিংবা মৎস্য খাতের জন্য এটি খুলে দিতে পারে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভবিষ্যতের জন্য খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো প্রাকৃতিক একটি বিশাল ও অনাবিষ্কৃত সম্পদের উৎস হতে পারে এই ম্যারিন ভ্যালি। সামগ্রিকভাবে দেশের ভূমি ইকোনমির জন্য খুলে দিতে পারে সম্ভাবনার এক নতুন দুয়ার। তাই বলা যায়–

"সমুদ্রের ঢেউ যেমন থামে না,
তুমিও তোমার স্বপ্নের পথে থামবে না।"

বাংলাদেশের বাস্তুতন্ত্রে সুন্দরবনের ভূমিকা

শেফালী মন্ডল
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

"গরানগাছে পরান নাচে সবুজ পাতার ফাঁকে
আদুল আকাশ অবাক হয়েই সুখের স্বপন আঁকে।
চাঁদটা যখন গল্প শোনায় ছোট্ট তারার কাছে
সুন্দরীগাছ সুবাস ছড়ায় দু-হাত তুলেই নাচে।"

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন যেমন বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থান, শত সহস্র মানুষের রোজগারের উৎস, নানান প্রজাতির পশুপাখি ও গাছপালার আবাসস্থল, তেমনি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার্থে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রাভিনেতা। এটি বিশেষ করে বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলকে বঙ্গোপসাগর হতে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষার্থে ঢাল হিসাবে কাজ করে। তাছাড়া এর ভিতরে থাকা গাছপালা বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা রেখে থাকে।

১০,০০০ বর্গকিমি জুড়ে ব্যাপ্ত সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এটি তার ঘন ম্যানগ্রোভ বনের মাধ্যমে ঝড়ের বাতাসের গতিবেগ ও জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা অনেকখানি কমিয়ে লোকালয়কে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও জানমালের ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করে। সিডর, আইলা, আম্পান ও রিমালের মতো ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবন নিজেই অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে লক্ষাধিক মানুষকে রক্ষা করেছে।

সুন্দরবন মূলত ঘন ঘন ম্যানগ্রোভ গাছপালা, জোয়ারের জলপথ, কাদামাটি ও ছোট ছোট দ্বীপ দ্বারা গঠিত। ভূমি ও জলের মধ্যে জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক এটিকে বিশ্বের অন্যতম বাস্তুতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলছে। সুন্দরবনের লোনাজল বিস্তৃত জলজ জীবনকে সমর্থন করে। অন্যদিকে এর মাটি এবং বায়ু স্থলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতকে সমর্থন করে। বনের প্রাকৃতিক চক্র জোয়ারের ছন্দ দ্বারা প্রভাবিত হয় যা একটি প্রাণবন্ত এবং ক্রমাগত বিকশিত আবাসস্থল তৈরি করে।

সুন্দরবন দক্ষিণ এশিয়ার একটি জীববৈচিত্র্যময় অঞ্চল। এখানে ২৬০ প্রজাতিরও বেশি পাখি, ১২০ প্রজাতির মাছ, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ বাস করে। এর মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বেশি পরিচিত ও বিখ্যাত। এই বনমোহনা কুমির, গঙ্গা এবং ইরাবতী ডলফিনের মতো

বিপন্ন প্রজাতির অভয়ারণ্য প্রদান করে ।

সুন্দরবনের সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে তার আশেপাশের এলাকার বসবাসকারী ৩৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ। স্থানীয়রা মাছধরা, কাঁকড়া ও চিংড়ি সংগ্রহ, মধু সংগ্রহ এবং গোলপাতা ও অন্যান্য বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এই ধরনের বনজ সম্পদগুলো কেবলমাত্র খাদ্য ও আয়ের উৎস নয় বরং এটি বাংলাদেশের একটি ক্রমবর্ধমান শিল্প এবং সুন্দরবন একটি প্রধান আকর্ষণ। দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা এর মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ও বন্যপ্রাণীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন। এর ফলে দেশের অর্থনীতি আরও উন্নতির দিকে ধাবিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণতা পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ। সুন্দরবনের গাছপালা তাদের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়ার কাজে কার্বন-ডাইঅক্সাইড শুষে নেয়। যার ফলে জলবায়ু বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য বজায় থাকে। বনের ভেতরের নদী-খালে থাকা নানা প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ির প্রজননকেন্দ্র বা নার্সারি হিসাবে কাজ করে সুন্দরবন। এ বন উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ অক্ষুণ্ন রাখে এবং মৎসের ঘাটতি কমায়।

সুন্দরবন শুধু বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাই নয়, এটি দেশের পর্যটন শিল্পের একটি অন্যতম অংশ। যেখানে দেশের নানা প্রান্ত থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও পর্যটকরা সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন। এখানকার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ফলে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, হোটেল, গাইড সার্ভিসের মতো খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

সুন্দরবন আমাদের গর্বের প্রাকৃতিক সম্পদ, যা আমাদের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং মানুষের জীবন-জীবিকাকে অমূল্য সহায়তা দেয়। সুন্দরবন কেবল একটি বন নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং পরিবেশের সমন্বয়ে গঠিত এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের কর্তব্য হলো এটি সংরক্ষণ করা যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে।

সুন্দরবন

জান্নাতুল ফেরদৌস রাইয়া
শ্রেণি : একাদশ, মানবিক বিভাগ, রোল : ২৫৫৯৬

বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে বিস্তৃত অংশ জুড়ে অবস্থিত সুন্দরবন। বিরল জীববৈচিত্র্য, বিচিত্র গাছ-গাছালি, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি, নদী-খাঁড়ি-জলপথ, সর্বোপরি বাংলার রাজকীয় বাঘ সুন্দরবনের ঐতিহ্য। প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠে ও সংরক্ষিত অবস্থায় টিকে থাকা পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অভয়ারণ্যের অনন্য দৃষ্টান্ত সুন্দরবন। এ কারণে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদ (UNESCO) ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সুন্দরবনকে 'World Heritage' বা 'বিশ্ব ঐতিহ্য' বলে ঘোষণা করে। পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে এই অরণ্যের অজস্র জলাভূমি ও মোহনা পরিযায়ী পাখির বিচরণক্ষেত্র। পর্যটন, বিজ্ঞান, গবেষণা, তথ্য ও তত্ত্বের ভাণ্ডার এই ঐতিহ্যবাহী অরণ্যভূমি আমাদের গর্ব। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জলাবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাব আর চিরসঙ্গী দারিদ্র্যের কারণে বিপন্ন হয়ে উঠে পড়েছে সুন্দরবন ও তার জীববৈচিত্র্য। সুন্দরবনের সুমিষ্ট মধু বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। এপ্রিল আর মে মাস সুন্দরবনের মধু সংগ্রহের সেরা সময়।

যারা এই মধু সংগ্রহ করে, তাদের মউলি বলে। সুন্দরবনে খলসি, গেওয়া, কেওড়া, গরান ইত্যাদি গাছে মৌচাক দেখা যায়। সেখান থেকে মউলিরা মধু ও মোম সংগ্রহ করেন, যার দ্বারা তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হয়। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায়, ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার, যার মধ্যে বাংলাদেশের অংশ ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। বাকি অংশ ভারতে অবস্থিত। বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা জুড়ে এ বন বিস্তৃত। সুন্দরী নামে এক ধরনের গাছের প্রাধান্য থাকায় এ বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন। সুন্দরবনে রয়েছে বৃক্ষ, লতাগুল্ম, ঘাস, পরগাছাসহ ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ। সুন্দরবনের সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওরা, বাইন, পশুর, কাকড়া, ধুন্দুল, ওঁড়া ইত্যাদি বৃক্ষ খুব মূল্যবান। এছাড়া এ বনের সবখানেই গোলপাতা জন্মে। সুন্দরবনে প্রায় ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৮ প্রজাতির উভচর এবং ৩২০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। এছাড়াও রয়েছে বানর, শিয়াল, চিত্রা ও মায়া হরিণ ইত্যাদি। পাখির মধ্যে বক, সারস, হাড়গিলা, কাদাখোঁচা আরও নানা প্রজাতির পাখি। সরীসৃপের মধ্যে রয়েছে কুমির, সাপ ইত্যাদি। সুন্দরবনের পানিতে প্রায় ২২২ প্রজাতির মাছ রয়েছে। এই বিশাল বনভূমি উপকূলবর্তী সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করে। এছাড়া এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও অনেক।

স্থানীয় লোকজন বন থেকে পাতা, মধু, কাঠ, ফল, গাছের বাকল ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ভাবে সরবরাহ করে। বাংলাদেশ তথা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুন্দরবনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তাই সুন্দরবন ও এর প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। এ বনের সব গাছই প্রায় বঙ্গোপসাগরের নোনা পানিতে বেঁচে আছে। কিছু কিছু অংশে বনের ঘনত্ব এত বেশি যে সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছায় না। আমাদের সকলের উচিত এই বনের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করা। কারণ এটি আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। তাছাড়া এই বন বাস্তুতন্ত্রের এক অমূল্য সম্পদ।

মোংলার বিলিয়ন ডলার শিল্প

মো : আব্দুল্লাহ হাওলাদার
শ্রেণি : একাদশ, মানবিক বিভাগ, রোল : ২৫৫৫৭

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের একটি দেশ। বাংলাদেশ একটি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ। বাংলাদেশে মোট ৪টি সমুদ্র বন্দর রয়েছে এর মধ্যে মোংলা বন্দর অন্যতম। বাংলাদেশের দক্ষিণে পশুর নদীর কোল ঘেষে গড়ে উঠেছে মোংলা ইপিজেড। মোংলা ইপিজেড বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। বাংলাদেশে মোট ৮টি ইপিজেড রয়েছে এর মধ্যে মোংলা ইপিজেড অন্যতম।

অবস্থান ও স্থাপনা

* অবস্থান : বাগেরহাট জেলার মোংলা বন্দর এলাকায়।
* ঢাকা থেকে দূরত্ব প্রায় ২১০ কিলোমিটার।
* স্থাপিত : ১৯৯৮ সালের ২৩ মে মাসে।
* এলাকা প্রায় ৩০২.৯৭ একর।
* শিল্প প্লট রয়েছে ২৭৮টি।

সুবিধাসমূহ

* শুল্কমুক্ত সুবিধা : কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত।
* ট্যাক্স ছাড় : নতুন শিল্পের জন্য কয়েক বছরের ট্যাক্স অব্যাহতি।
* অবকাঠামো: প্লট ভাড়া কম (প্রায় US$ 1.25 / বর্গমিটার/বছর) ইউটিলিটি সুবিধা (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস)।

অর্থনৈতিক তথ্য

* মোট বিনিয়োগ : প্রায় ২৫৩.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
* মোট রপ্তানি : প্রায় ১,৫৬৭.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
* কর্মসংস্থান : প্রায় ১৪,৪৫৮ জন। বেশির ভাগ বাংলাদেশী নাগরিক।
* চালু কারখানা: বর্তমানে ৩০-৪০টি মতো চালু, কয়েকটি প্রক্রিয়াধীন। এক দশকে রপ্তানি বেড়েছে ১৬ গুণ।

প্রধান পণ্য ও শিল্প

এখানে উৎপাদিত প্রধান পণ্যগুলো :

* ব্যাগ ও লাগেজ।
* গার্মেন্টস অ্যাক্রেসরিজ ও টেক্সটাইল
* পাট ও পাটজাত পণ্য
* ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিক্যাল প্রোডাক্টড
* অ্যাগ্রো প্রসেসিং
* লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
* সার্জিক্যাল গাউন, কার সিট হিটার, সিগার-সিগারেট, রোপ ইত্যাদি।

বিনিয়োগকারী দেশ : চীন, ভারত, জাপান, দক্ষিণকোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশী কোম্পানি।

অন্যান্য তথ্য

* এটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
* এটি দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক হাব হিসেবে গড়ে উঠছে, যেখানে আগে মূলত মাছ ধরা ও বনজ সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি ছিল।
* কর্মীদের মধ্যে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। তবে কিছু প্রতিবেদনে মজুরি ও কর্ম পরিবেশ নিয়ে আলোচনা রয়েছে।
* সম্প্রতি কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

এই ইপিজেড দেশের রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং দক্ষিণাঞ্চলের শিল্পায়নেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রীতি বিশ্বাস

শ্রেণি : একাদশ, মানবিক বিভাগ, রোল : ২৫৫০৭, শিক্ষাবর্ষ : ২০২৫-২০২৬

"Education is the backbone of a nation,"

মানুষের মেরুদণ্ডের মতো শিক্ষাও একটি জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে পরিগণিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমে জাতি এগিয়ে যায় এবং উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সন্তোষজনক চিত্র আমাদের চোখে পড়ে না। তবে আশার কথা হচ্ছে শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার মান, শিক্ষানীতি, শিক্ষার জন্য বরাদ্দ, শিক্ষার পরিবেশ প্রভৃতির উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মানুষের সত্যিকারের পরিচয় তার মনুষ্যত্ব ও যোগ্যতার মধ্যে। মানব সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই একজন পরিপূর্ণ মানুষের সব গুণ তার মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে না। এসব গুণাবলী অর্জনের জন্য মানুষকে বিভিন্ন উৎস থেকে যে জ্ঞান অর্জন করতে হয় তাই শিক্ষা। অর্থাৎ মানুষের মানসিক, দৈহিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ধারাবাহিক পদ্ধতি হলো শিক্ষা।

বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার শতকরা ৫১.৮% (আদম শুমারি ২০১১)। ২০১০ সালের ৩১শে মে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ মন্ত্রীসভায় অনুমোদন লাভ করে। এ শিক্ষানীতিতে মোট আটাশটি অধ্যায় ও দুটি সংযোজনী রয়েছে। এ শিক্ষানীতিতে কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা। দেশের জিডিপির ১.৬ ভাগ ব্যয় হয় শিক্ষাক্ষেত্রে আর সরকারি সার্বিক ব্যয়ের মাত্রা ১৫ ভাগ বরাদ্দ এই ক্ষেত্রে উন্নয়নে। বছরে প্রায় ৭৮ ভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যন্ত সবার জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে।

এছাড়াও ৫ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার (১ বছরের জন্য) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতির আলোকে ৪ বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স চালু রাখা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বহুমুখী সংকট রয়েছে। নিম্নে সেগুলো সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো–

* যুগোপযোগী শিক্ষার অভাব: বর্তমান যুগকে বিশ্বায়নের যুগ বলা হয়। সেই যুগে বর্তমান শিক্ষা

ব্যবস্থা প্রযুক্তি নির্ভর না হওয়ায় বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। যা আমাদের জীবন পিছিয়ে দিচ্ছে।

* বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা : শিক্ষাদানের গুণগত মান, বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের উপকরণাদি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার ফলে শিক্ষা বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

* মুখস্থনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা : ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ কম থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের মুখস্থনির্ভর শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে। যা অন্যতম একটি সংকট।

* ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহা : বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি কেবল একটি ভাষার নাম নয় বরং এটি টেকনোলজির অপর নাম। কিন্তু মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় নামসর্বস্ব ইংরেজি শেখানো হয় যা প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে ওঠার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

* শিক্ষকদের আন্দোলন : বেতনভাতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বর্তমানে শিক্ষকরা আন্দোলনে রাস্তার নামছেন যা পড়াশুনায় ব্যাপক আকারে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

* প্রশ্নপত্র ফাঁস : একটি বিশেষ মহলের সহায়তায় এই ঘৃণ্য অপরাধটি সংঘটিত হচ্ছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃত-মেধার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে না। যা আমাদের উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

* ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাস : বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ও সন্ত্রাস অনুপ্রবেশ করায় পড়াশুনার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। রাজনীতিতে ছাত্ররা ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন আন্দোলনে শিক্ষাঙ্গন স্থবির হয়ে পড়ছে।

এখন এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকট সমাধানের উপায় ও আমাদের যা করণীয় তা হলো– যে জাতি যতো বেশি শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি উন্নত। শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট সমাধান কল্পে আমাদের নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে–

* শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, বিজ্ঞানসম্মত, কর্মমুখী, প্রযুক্তি নির্ভর ও বাস্তবসম্মত করতে হবে।

* শিক্ষা ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং যাবতীয় বৈষম্য দূর করতে হবে।

* শিক্ষা ক্ষেত্রে যাতে মেধার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয় এজন্য মুখস্থনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

* বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টার, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করে শিক্ষার যথাযথ মান বজায় রাখতে হবে।

* শিক্ষকদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

* শিক্ষা প্রশাসনকে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব মুক্ত করতে হবে।

* প্রশ্নপত্র ফাঁস কঠোর হাতে দমন করতে হবে।

* স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালের 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকে বর্তমান পর্যন্ত বেশ কিছু শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। এখনকার বাস্তবতায় বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি যুগোপযোগীভাবে প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশে সংকটমুক্ত একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন এখন সময়ের দাবি। পদ্ধতি পরিবর্তন এবং প্রচলিত পদ্ধতিকে বাস্তবসম্মত ও দুর্নীতিমুক্ত করে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তবসম্মত ও বাস্তবায়নযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই বাস্তব জীবনে চরম উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব হয়। জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে জীবনে উৎকর্ষতা লাভ করা সম্ভব হয়। সর্বোপরি কবির ভাষায় বলি–

"বিভিন্নভাবে হচ্ছে দূষিত আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি
শিক্ষার থেকে বাড়ছে শুধু বিদ্যালয়ের আকৃতি
যদি পেতে হয় শিক্ষাকে তার যোগ্যস্থান,
দিতে হবে অবশ্যই তবে রাজনীতির প্রস্থান
সুচিন্তাকে করলে কদর বাড়বে শিক্ষার কদর
এই পন্থা বেছে নিলেই পাবে শিক্ষা আদর।"

ART

Oiswrjyo Halder
Class : XI, Business Studies : 25245
Academic Year : 2025-2026

"Art has the answers to many of the questions that we weren't brave enough to ask."

Art is a challenging endeavor that demands a delicate balance of creativity, critical thinking and a profound understanding of the diverse facts of artistic expresion. For a long as humanity had existed art hasbeen part of our lives. It expresses emotions or expressions of life. Art is a creative activity. It produces a product or object. It is a diverse range of human activities in creating visual, Performing subjects and expressing the author's thoughts.

There are sculptures, cave painting and rock art dating from the upper Paleolithic era. All of the great ancient civilizations such as Acnient Egypt, China, Greece, Rome hand works and styles of art. In Europe, after the Middle Ages, there was a "Renaissance" Which means 'rebirth." People rediscovered artists were allowed to paint. People like Michelangelo and Leanardo da Vinci Still for religious pictures.

There are 7 major forms of Art Which are painting, Sculpture, Architecture, Literature, Cinema, Theater, Music, Without this 7 forms there are also many forms which are available nowadays Such as Potography, Calligraphy, Print making, dance, etc. The Principles of Arts (balance, contrast, emphassis, movement, Patlern, rhythm and unity) represent how the elements of Art (line, shape, color, value, form, texture and space) are used by and artist to create the work of art. Those who make art are called artists. Life of an artist is often one of the greatest creative and passionate but also of hard working and dedicated

persons. They hope to affect the emotions of people who experience it. Some times a person who is very good at their Job is called an artist even if is not considered as art. Pablo picasso was a spanish painter, sculptor, creamiest, Who developed cubism one of the most influential modren painting styles. For many people he is the greatest art genius of the twentieth century.

"Love an artist and become a master piece" of aesthetic.

Art can help us in a lot of ways. Art makes us feel better about our selves. It is very essential for us. It helps in Physical development and enhancing gross and motor skills.

"One each speak poetry Just by arranging colours wall."

ভাষা বিড়ম্বনা

মনোজকান্তি বিশ্বাস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মোংলা সরকারি কলেজ

মানব-ইতিহাসে ভাষার রূপরেখায়
প্রথম দেখা ইন্দোইউরোপীয় ভাষায়,
হোক সে খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার,
এখন প্রত্যহ ডানামেলি স্বভাবী স্বভাষায়।

বিজাতীয় লোকের ঠোঁটের ভাষা
দেখি শুধু; শুনি শুধু; মাথাও নাড়ি
বচনসুধা বুঝিনা কিছুই-
অথচ তার হাসি-কান্না বুঝি; ইঙ্গিত বুঝি
মুখের অবয়ব বুঝি, ঠোঁটের স্পন্দন বুঝি,
অভিমান বুঝি, প্রিয় মুহূর্ত বুঝলেও
তার স্বপ্ন বুঝিনা কেবল দুর্বোধ্যতায়!

আমার ভাষা বোঝেনি বলেই
ট্রেনে দেখা সে-ই বয়স্ক লোকের রূঢ়স্বর
চোখ রাঙানি নীরবে হজম করেছিলাম
কী দোষ ছিলো আমার?
ভাষা না বোঝায় দায় শুধু কী আমার?
সে কী চেয়েছে তার ভাষাকে বিশ্বজনীন?

মনে মনে হেসেছিলুম খানিক,
নিজেকে সামলে প্রবোধিত করি
যদি জানতো আমার বাংলা ভাষার
গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা;

বাংলার সুমিষ্ট প্রাণময়তার কথা,
তার দৃষ্টি পালটে যেতো হয়তো!
বুঝিনি তার পাখির ঠোঁটের অপভ্রংশ বুলি।

সাইবেরিয়ার যে অতিথি পাখি এসে
খেতে ধান খায়, বিলে সাঁতার কাটে-
তাকেও বুঝি, পরের শীতে তার
এদেশে ফিরে আসার আকুতিও বুঝি!
সুন্দরবন জুড়ে হাজারো প্রাণীর ভাষা বুঝি,
গৃহপালিত প্রাণীর ভাষা কে না বোঝে?

বুঝি না কেবল পৃথিবীর নানা বর্ণ ভাষার বুলি,
অথবা যে আমাকে ঘরের মধ্যে
বোঝায় রাত দিন তার স্বদেশী ভাষাও
জীবনে কখনো কখনো দুর্বোধ্য ঠ্যাকে!

ভাষার এই আতুরাশ্রমে চেয়ে থাকি
মুখপানে, কল্পনায় অকল্প অনুমানে
বুঝিনা যে ভাষা তার সাথেই আড়ি;
বাংলা ছাড়া দম আটকায় ভিন ভাষা,
শুধু আমার বাংলারই আছে
রক্ত রঞ্জিত ইতিহাসের চেতনার রং,
আছে হাজার ফুলের সৌরভ জড়ানো
চর্যাগীতির সুরে মেশানো,
ভাষা শহিদের হাজার বছরের ভাষার রূপকথা!

ভাষার ট্রেনে চলছে মানুষ যুগান্তরে ভাই
দেশান্তরে গেলে পরে নানান ভাষা পাই।

শৈশব স্মৃতি

নন্দ কিশোর পাল
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মোংলা সরকারি কলেজ

মাটির উঠোনে রোদ্দুর ছিল সোনার মতো নরম,
খালি পায়ে দৌড়াতাম, ছিল না কোনো বারণ।
আকাশভরা ঘুড়ির ডানায় স্বপ্ন উড়ত দূরে,
বৃষ্টিভেজা বিকেল জুড়ে হাসির ঝরঝর সুরে।

আম কুড়োনো দুপুরগুলো, কেয়াপাতার নৌকা,
পুকুর জলে ছপছপিয়ে সময় যেত বোকা।
মায়ের ডাকে সন্ধ্যা নামত ধোঁয়া ওঠা ভাতে,
রূপকথারা জেগে উঠত কুপির ক্ষীণ আলোতে।

বন্ধুদের সাথে ছোট্ট ঝগড়া, আবার মিলের সুখ,
চকলেট ভাগাভাগিতে ঝরে যেত সকল দুঃখ।
কতই না অভাব ছিল কত অভিমান,
তবু শৈশব যেন নীল আকাশে তুলোর মতো প্রাণ।

আজও মনে পড়ে গেলে মনটা যে যায় ভিজে,
ফিরে পেতে ইচ্ছে করে সেই দিনগুলো নিভৃতে।
শৈশব মানে হৃদয়জুড়ে নির্মল সাদা আলো–
যত দূরে যাই না কেন, সে থাকে ভালোই ভালো।

ঋতুর আগমন

সানজানা
একাদশ শ্রেণি, রোল-২৫৫৭৯
মানবিক বিভাগ, শিক্ষাবর্ষ-২০২৫/২০২৬

শীত বলছে যাব যাব,
গ্রীষ্ম বলে যা,
মুকুল ফোটার সময় হলো
ফাল্গুনেতে পা।
রুক্ষ ধরায় ঠাণ্ডা গরমে
শরীর চলে না,
খাইয়ে গেলি কত্ত কিছু
ভোলা যাবে না।
তপ্ত বাতাস বইবে এবার,
ধরায় সবাই ক্লান্ত,
ঝড়ের দাপট লাগাম টেনে
করবে কে তা শান্ত।
তোর আশাতে দিন গুণবে
শুকিয়ে যাওয়া মাটি,
এসে আবার শীতল করে
রাখিস পরিপাটি!
ঋতু যায় ঋতু আসে
খবর কে তার রাখে,
একটা একটা ঋতু আসে
নতুন ছবি আঁকে।

মোংলা সরকারি কলেজ

ফাতিহা আক্তার ইমি
একাদশ শ্রেণি, রোল-২৫৫১৮
মানবিক বিভাগ, শিক্ষাবর্ষ -২০২৫/২০২৬

সবুজ গাছের ছায়াঘেরা, শান্ত নিরিবিলি প্রাঙ্গন,
স্বপ্ন বোনে তরুণ প্রাণে জাগে নতুন স্পন্দন।
নদীর হাওয়ায় ভেসে আসে আশার মিষ্টি গান,
জ্ঞানে আদর্শে গড়ে ওঠে বাংলাদেশের প্রাণ।

শ্রেণিকক্ষে আলো ঝরে শিক্ষাগুরুর বাণী
জ্ঞানতৃষ্ণা মেটান তিনি অজানাকে জানি।
বন্ধুত্বের হাসি কান্না চলে সারাক্ষণে
ভবিষ্যতের রঙিন ছবি এঁকে চলে মনে।
কলেজ শুধু ইট-পাথর নয়, স্বপ্ন গড়ার ঠিকানা,
মানবতা, সততা পাঠে কত কিছু যায় জানা!
সংগ্রামের পথ দেখিয়ে শেখায় দাঁড়াতে দৃঢ় পায়ে,
ভালো-মন্দ আর নিজের শক্তি চিনতে শেখায়।
হে প্রিয় মোংলা সরকারি কলেজ
তোমার আঙিনায় বড় হয় কত আশা
তোমায় নিয়েই অসীম গর্ব, কালের সাক্ষী তুমি,
তুমিই আমাদের ভালোবাসা।

কবিতা তুমি কী?

ইফসানা সুলতানা স্বর্ণালী
শ্রেণি -একাদশ, রোল-২৫৬৪৬
মানবিক বিভাগ।

কবিতা তুমি পুরুষ না–কি নারী?
না–কি পথে পড়ে থাকা ক্ষুধার্ত মানুষ সারি সারি।
কবিতা তুমি কি দেয়ালে বন্দি কোনো বিবস্ত্র রমণীর দীর্ঘশ্বাস,
না–কি বিদ্রোহী কবির না-বলা-কথার এক করুণ ইতিহাস।
কবিতা তুমি কি ৮ই ফাল্গুনের রক্তে আঁকা ভাষা শহীদের আল্পনা?
কবিতা তুমি কি ছেলে হারানো শহীদ জননীর ব্যথাতুর যন্ত্রণা।
কবিতা তুমি কি শহীদ-বেদীতে ঝরাফুলের আর্তনাদ,
না–কি মিছিলে মিছিলে রাজপথ কাঁপানো শ্রমিকের ফরিয়াদ।
কবিতা তুমি কি মানবতার মিছিলের চিরযৌবনা অগ্র পথিক,
না–কি মুখ গুঁজে পড়ে থাকা যুদ্ধের ময়দানে আহত সৈনিক।
কবিতা কি তুমি মধ্যবিত্ত পিতার অপারগ নীরব অশ্রুজল,
না–কি চোখের কোণে জমে থাকা জলে শ্যাওলা শতদল।

গর্ব

জান্নাত নাহার
শ্রেণি : একাদশ, মানবিক বিভাগ
রোল : ২৫৫২৫

সূর্য্যি কহে চাঁদকে ডেকে
আলো নিয়ে জীবন বৃথা,
তুমি হলে আলোহীন,
তুমি ছাড়া আমি কোথা?

সত্যিই যদি বলি তবে
সূর্য তারা শোনো সবে।
আমি হলাম রাতের আলো,
যখন সবই গভীর কালো।
আমার আলোয় মুগ্ধ সবে,
বৃথা জীবন কেন হবে?
তুমি হলে আলোয় ভরা
তাইতো তুমি গর্বে হারা।
গর্ব করা নয়কো ভালো,
গর্বে জীবন ভরে কালো।

প্রাপ্তি

বিচিত্র পোদ্দার
শ্রেণি : একাদশ, বিজ্ঞান বিভাগ, রোল : ২৫০২২

কিভাবে বলবো তুমি আমার কে হও?
আমার প্রাপ্তি তুমি।
সকালে প্রথম প্রহরের আলো তুমি,
ভোরবেলা কোকিলের সুরেলা গান তুমি
আমার প্রাপ্তি তুমি।
দুপুরের বেগুনী রোদ তুমি,
বিকালে বওয়া হালকা হাওয়া তুমি,
পুজোর ঘরে সন্ধ্যা বাতি তুমি,
তুলসীতলার উজ্জ্বল প্রদীপ তুমি,
আমার প্রাপ্তি তুমি।
আমার রাতে ঘুমানোর কারণ তুমি,
স্বপ্নে দেখা সুন্দরী পরিটা তুমি,
আমার প্রাপ্তি তুমি।
কড়ি থেকে ফোঁটা ফুল তুমি,
আকাশে থাকা চাঁদ-তারা তুমি,
আমার দিন ও রাত তুমি,
কল্পনা তুমি, ইচ্ছা তুমি,
আমার প্রাপ্তি তুমি।
আমার হঠাৎ মুচকি হাসি তুমি,
অসীম প্রার্থনা করার তুমি।
আমার প্রতিটা মুহূর্ত তুমি,
আমার মৃত্যুর পর সাত মিনিট তুমি
আমার প্রাপ্তি তুমি...
আমার প্রাপ্তি তুমি...

কলেজের দিনগুলো

হাওলাদার ইমতিয়াজ হোসাইন
শ্রেণি : একাদশ, বিজ্ঞান বিভাগ, রোল : ২৫০০৭
মোংলা সরকারি কলেজ

কলেজের সেই প্রথম দিন
নতুন মুখ, নতুন অভিজ্ঞতা
নতুন পরিচয়ে বন্ধুত্ব তখন,
মনে জেগে ছিলো এক অদ্ভুত আনন্দ!
ক্লাসের ফাকে আড্ডা জমে;
হাসি ঠাট্টায় সময় কাটে,
গল্প-আলাপ, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগিতে
বন্ধুত্বের সম্পর্কের গভীরতা বাড়ে।
পরীক্ষার আগের রাতের পড়া
স্বপ্নের মাঝেও চিন্তার রেখা
এই ছবি একদিন আঁকা শেষ হয়
স্মৃতির পাতায় রয়ে যায় মহাকাল।।

পুথি, মোংলা

তমা মন্ডল
শ্রেণি : স্নাতক (সম্মান), হিসাববিজ্ঞান বিভাগ (৪র্থ বর্ষ), রোল : ১২৫

আহারে দক্ষিণেতে বাদাবন, পশুর পশ্চিম পাশে
এই খানেরই বায়ু-জল আত্মায় আছে মিশে, বলব নিজের কথা,
বলব নিজের কথা এই বারতা দিব সবার কাছে
কালের ধারায় প্রিয় মোংলা অনেক পাল্টে গেছে, পাল্টায় জীবনের তাল,
পাল্টায় জীবনের তাল পিছনের সাল হয়ে গেছে গত,
বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে মাঠে লাঙ্গল দিত, এইতো হাল বৈশেখী,
এইতো হাল বৈশেখী বলে রাখি কৃষি অর্থনীতি
বর্ষার সাথে চাষাবাদ এটাই ছিল রীতি, আষাঢ়ে ধান ভিজানো,
আষাঢ়ে ধান ভিজানো সবাই শোন ভাদ্রে রোয়ার ধুম,
কিষাণ জব্দ কাজের চাপে নাইরে খাওয়া-ঘুম, খেত আইলের পরে,
খেত আইলের পরে গামছা পরে হাতে নিয়ে থাল,
ভাত নিয়ে বিলে যাচ্ছে দেখিনা আজ-কাল, আসত পরবাসী,
আসত পরবাসী মুখে হাসি ফুটত ধান কেটে,
পাকা ধান ঘরে নিয়ে আসত আঁটি এঁটে, নাইরে ধানের গোলা,
নাইরে ধানের গোলা সকাল বেলা চাষি হাকে নারে,
নোনাজল সারা বছর বিলে রাখে ধরে, কইরে মাঠের গরু?
কইরে মাঠের গরু হল সরু নারকেল গাছে মাথা,
পৌষ মাসে আর দেখিনা গাছে ঠিলে পাতা, কোথায় পাব গাছি?
কোথায় পাব গাছি ভুলে গেছি ঝরার মিঠের স্বাদ,
জিড়েন কাটের রসের পায়েস কবে দিলাম বাদ, আরও বরই মাখা,
আরও বরই মাখা আঁকা বাঁকা তেঁতুল দিয়ে গুড়ে
কলস ভরা রোয়া মিঠে খেত বছর জুড়ে, ছিল দুধের হাড়ি,
ছিল দুধের হাড়ি পাল বাড়ি ঘুরত কাঠের চাকা,
মাটির তৈরি হাঁড়ি, সরা ভরতো বাঁশের ঝাকা, আসত গাঁয়ে-গাঁয়ে

আসত গাঁয়ে-গাঁয়ে ভরে নায়ে থাকত কোন খালে
বেচত মাটির ঝাইলো, ঝাঁঝর ধান মেপে দিলে, ধান রাশি রাশি
ধান রাশি-রাশি পাশা-পাশি গরু হাঁটত ঘুরে
পাকা ধান যেত ঝরে গরুর খুরে খুরে, মলতো ধানের মলন
মলতো ধানের মলন ছিল চলন গরু মহিষ দিয়ে,
বায়ে থাকত যেই গরুটা, বলত তাকে মে..য়ে.., সবাই দেখত চেয়ে
সবাই দেখত চেয়ে, ছেলে-মেয়ে এসে করত ভিড়,
গো... রো..ট.. ঠায়-ঠায় শব্দ তুলে ছুটত যে অস্থির, মোটা পাকত পরে
মোটা পাকত পরে আসত ঘরে আগে রাজাশাইল
নবান্নের উৎসব করতে বালাম ধানের চাল, আরও শীতের পিঠা
আরও শীতের পিঠা চিড়ে কোটা চলত ঢেঁকি ঘরে
পোড়ত, পোড়ত দিলুমের টান মারত খানিক পরে, হুড়ুম আছে বাকি
হুড়ুম আছে বাকি বলে রাখি পঞ্চমীর গোণে
মাঘ আসে আজও ভাসে দুই-এক জনের মনে, কতো রঙ্গিন স্মৃতি
কতো রঙ্গিন স্মৃতি মধু অতি হাইচে গাজির গান
যাত্রা পালার স্বপ্ন দেখে উতলা হয় প্রাণ, প্রাণের স্বস্তি কিসে?
প্রাণের স্বস্তি কিসে বাগদা এসে আশা জেগেছিল,
বিক্রি হয় সোনার দামে, কলটাতো বেশ ভালো, সোনায় খাদ আছে!
সোনায় খাদ আছে সবার কাছে বলা প্রয়োজন,
পোনা ছাড়ার সময় লাগে সমিতির লোন, বাঁচার উপায়টা কী?
বাঁচার উপায়টা কী ভেবে দেখি লেখা-পড়া শিখে,
পরিবর্তন সাথে নিয়ে থাকব টিকে, কেন পিছে রবো?
কেন পিছে রবো সফল হবো সকল ভালো কাজে,
তাল মিলিয়ে চলবে মোংলা বিশ্ববাসীর মাঝে, মেধার বিকাশ হলে,
মেধার বিকাশ ঘটে সত্য বটে পরিশ্রমী হলে,
উন্নত জীবন ধারা গড়ব সবাই মিলে, মোংলার উন্নতি হোক,
মোংলার উন্নতি হোক, মোংলার উন্নতি হোক ॥

কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক-কর্মচারীদের তালিকা

ক্রমিক নং	শিক্ষকবৃন্দের নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ
১	জনাব সুশীল কুমার সরকার (বাংলা)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	০৯/০৭/১৯৮১
২	জনাব স্বপন কুমার বিশ্বাস(ইতিহাস)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	০৯/০৭/১৯৮১
৩	জনাব সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস(বাংলা)	প্রভাষক	০৯/০৭/১৯৮১
৪	জনাব সুশান্ত কুমার দাশ	প্রভাষক	০৯/০৭/১৯৮১
৫	জনাব এনামুল কবীর (অর্থনীতি)	প্রভাষক	০৯/০৭/১৯৮১
৬	জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মদ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	প্রভাষক	০৯/০৭/১৯৮১
৭	জনাব মৃনাল কান্তি শিকদার (রসায়ন)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	০৯/০৯/১৯৮১
৮	জনাব সরকার নলিনী রঞ্জন (হিসাববিজ্ঞান)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	২৭/১২/১৯৮১
৯	জনাব ফাহমিদা আফরোজ (ইসলামের ইতিহাস)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	১৩/০৩/১৯৮২
১০	জনাব তৈয়াবুর রহমান গাজী (উদ্ভিদবিদ্যা)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	২৫/০৫/১৯৮৩
১১	জনাব বিভাষ চন্দ্র বিশ্বাস (বাংলা)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক (উপাধ্যক্ষ)	০৫/০১/১৯৮৩
১২	জনাব অজিত কুমার পাল (গণিত)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	১৩/১১/১৯৮৩
১৩	জনাব আনন্দ মোহন বিশ্বাস (অর্থনীতি)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	১৮/০৭/১৯৮৩
১৪	জনাব মনোজ কুমার মন্ডল (ইংরেজি)	প্রভাষক	০৯/০৭/১৯৮৪
১৫	জনাব কার্তিক চন্দ্র সরকার (পদার্থবিজ্ঞান)	প্রভাষক	০৫/০২/১৯৮৪
১৬	জনাব বিপ্লব কুমার মিস্ত্রী (ব্যবস্থাপনা)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	০২/০১/১৯৮৫
১৭	জনাব নন্দ কিশোর অধিকারী (পদার্থবিজ্ঞান)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	০২/০২/১৯৮৫
১৮	জনাব বনমালা মৃধা (ইংরেজি)	প্রভাষক	০২/০৮/১৯৮৬
১৯	জনাব জগদীশ মন্ডল (ইংরেজি)	প্রভাষক	১৩/০৯/১৯৮৮
২০	জনাব পরভীন জাহান (বাংলা)	প্রভাষক	২৫/০৯/১৯৮৮
২১	জনাব আমজাদ হোসেন মোল্ল্যা (ইংরেজি)	প্রভাষক	০৪/০৫/১৯৮৯
২২	জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	প্রভাষক, অধ্যক্ষ	১১/০৯/১৯৮৯
২৩	জনাব হাওলাদার আবু জাফর (ইসলামের ইতিহাস)	প্রভাষক	১৭/১১/১৯৯১
২৪	জনাব কুবের চন্দ্র মন্ডল (ইতিহাস)	প্রভাষক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	১৭/১১/১৯৯১
২৫	জনাব মল্লিক অহিদুজ্জামান (অর্থনীতি)	প্রভাষক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	১৭/১১/১৯৯১
২৬	জনাব শেখ আনোয়ার হোসেন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	প্রভাষক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	১৭/১১/১৯৯১
২৭	জনাব গৌতম কুমার বিশ্বাস (হিসাববিজ্ঞান)	প্রভাষক	১৮/১১/১৯৯১
২৮	জনাব কৃষ্ণ পদ রায় (ইংরেজি)	প্রভাষক	১৫/১১/১৯৯২
২৯	জনাব মাধব চন্দ্র রুদ্র (দর্শন)	প্রভাষক	১৫/১১/১৯৯২
৩০	জনাব শেখ শামসুর রহমান (দর্শন)	প্রভাষক	০১/০৭-১৯৯৪
৩১	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াজেদ (ইসলাম শিক্ষা)	প্রভাষক	২১/১০/১৯৯৫
৩২	জনাব শুভময় ঘোষ (ইংরেজি)	প্রভাষক	০৫/০২/২০০১
৩৩	জনাব খন্দকার মাক্কামাম মাহমুদা (সমাজকল্যাণ)	প্রভাষক	০৫/০২/২০০১

৩৪	জনাব আনোয়ার হোসেন মৃধা (ইংরেজি)	প্রভাষক	২২/০৯/২০০২
৩৫	জনাব সুখদেব বিশ্বাস (ইংরেজি)	প্রভাষক	০৮/০২/২০০৩
৩৬	জনাব শ্যামল কুমার বিশ্বাস (ইংরেজি)	প্রভাষক	০৮/০২/২০০৩
৩৭	জনাব আরিফুজ্জামান (অর্থনীতি)	প্রভাষক	০১/০৯/২০২৪
৩৮	জনাব নাদিম মোহাম্মদ ফয়সাল (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	প্রভাষক	০৪/১২/২০২২
৩৯	জনাব খাদিজা খাতুন (ইসলাম শিক্ষা)	প্রভাষক	০৪/১২/২০২২
৪০	জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল (ইসঃ ইতিহাস)	প্রভাষক	০৪/১২/২০২২
৪১	জনাব নাজমুল হক (হিসাববিজ্ঞান)	প্রভাষক	০৪/১২/২০২২
৪২	জনাব বিকাশ চন্দ্র হালদার (জীববিজ্ঞান)	প্রদর্শক	৩০/০৬/১৯৯২
৪৩	জনাব কনিকা মণ্ডল (জীববিজ্ঞান)	প্রদর্শক	২৯/০৯/২০০২
৪৪	জনাব রণজ কুমার মণ্ডল (জীববিজ্ঞান)	প্রদর্শক	০১/০৩/২০০৮
৪৫	জনাব সেখ আবদুল জব্বার	শরীরচর্চা শিক্ষক	২৫/৬/১৯৯২

ক্রমিক নং	কর্মচারীবৃন্দের নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ
১	জনাব মনিমোহন অধিকারী	সহকারী গ্রন্থাগারিক	২৭/০৬/১৯৯২
২	জনাব রনজিৎ কুমার রায়	সহকারী গ্রন্থাগারিক	০১/০৫/১৯৮২
৩	জনাব খান আবুবক্কর সিদ্দিক	সহকারী গ্রন্থাগারিক	২১/০১/১৯৮৮
৪	জনাব ধ্রুব দাস মজুমদার	অফিস সহকারী	২১/১২/১৯৮৪
৫	জনাব সচিন্দ্রনাথ বিশ্বাস	অফিস সহকারী	০২/০১/১৯৮৫
৬	জনাব সমর হালদার	অফিস সহকারী	০১/০২/১৯৮৯
৭	জনাব সুকুমার বিশ্বাস	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০২/০১/১৯৮৫
৮	জনাব অনিল কৃষ্ণ বিশ্বাস	হিসাবরক্ষক	০১/০২/১৯৮৯
৯	জনাব বিমল কৃষ্ণ ভাণ্ডারী	হিসাবরক্ষক	২১/০১/১৯৮৪
১০	জনাব ফনিভূষণ মিস্ত্রী	এম.এল.এস.এস	০১/১২/১৯৮৩
১১	জনাব কালিতারা মিস্ত্রী	আয়া	১৮/১১/১৯৮৭
১২	জনাব পরিতোষ হালদার	এম.এল.এস.এস	১৫/১০/১৯৯৫
১৩	জনাব বিনয় মন্ডল	দিবাপ্রহরী	৩০/০৬/১৯৮২
১৪	জনাব আব্দুর রহমান	নৈশপ্রহরী	২৫/৬/১৯৯২
১৫	জনবা রাবেয়া বেগম	আয়া	২৭/০৬/১৯৯২
১৬	জনাব সুরেন্দ্র নাথ কীর্ত্তুনিয়া	নৈশপ্রহরী	৩১/০৬/১৯৮২
১৭	জনাব আব্দুস সোবহান হাওলাদার	নৈশপ্রহরী	১৩/০৯/১৯৮৮
১৮	জনাব মনমোহন বিশ্বাস	দিবাপ্রহরী	১৩/০৯/১৯৮৮
১৯	জনাব মুহসিন আকন্দ	বিজ্ঞানাগার সহকারী	২১/১২/১৯৮৪

কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ

অধ্যাপক কে এম রব্বানী
অধ্যক্ষ

শ্যামা প্রসাদ সেন
প্রভাষক
সমাজকর্ম

ড. অসিত কুমার বসু
প্রভাষক
সংস্কৃত

ড. অপর্ণা অধিকারী
প্রভাষক
সংস্কৃত

প্রদীপ অধিকারী
প্রভাষক
দর্শন

আবু ইব্রাহীম শাহ মোঃ বাকী বিল্লাহ
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিশ্বজিৎ মণ্ডল
প্রভাষক
গণিত

মনোজ কান্তি বিশ্বাস
প্রভাষক
বাংলা

এস.এম. মাহবুবুর রহমান
প্রভাষক
ইংরেজি

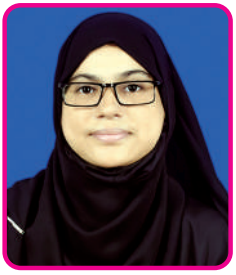

মমতাজ খানম
প্রভাষক
ইংরেজি

প্রমীলা রায়
প্রভাষক
ইতিহাস

সাহারা বেগম
প্রভাষক
ব্যবস্থাপনা

পাপিয়া হালদার
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোসাঃ নিলুফা খাতুন
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস

রঞ্জিতা মণ্ডল
প্রভাষক
সমাজকর্ম

বীনা বিশ্বাস
প্রভাষক
ভূগোল

রূপা দাস
প্রভাষক
বাংলা

নিগার সুলতানা সুমী
প্রভাষক
মার্কেটিং

দেবদাস বাড়ই
প্রভাষক
হিসাববিজ্ঞান

মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পলাশ চক্রবর্তী
প্রভাষক
হিসাববিজ্ঞান

নন্দ কিশোর পাল
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোঃ কামাল উদ্দিন
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোঃ মাহবুবুর রহমান
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মেহেদী হাসান
প্রভাষক
অর্থনীতি

আশিকুর রহমান
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রভাষক
ইতিহাস

মোঃ সাইদুজ্জামান মিন্টু
বিজ্ঞান প্রদর্শক
রসায়ন

শেফালী মণ্ডল
বিজ্ঞান প্রদর্শক
জীববিজ্ঞান

কলেজের কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ আজিজুল খান
অফিস সহকারী কাম
কম্পিউটার অপারেটর

গণেশ কুমার সাহা
অফিস সহকারী কাম
কম্পিউটার অপারেটর

বাসুদেব বিশ্বাস
অফিস সহায়ক

অজিৎ মণ্ডল
অফিস সহায়ক

রমেশ মণ্ডল
অফিস সহায়ক

মোঃ সাইফুল ইসলাম মোল্লা
অফিস সহায়ক

বিথিকা মিস্ত্রী
আয়া

কলেজে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স.) উদ্‌যাপন

কলেজে সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন

কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আলোকচিত্র

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম, এমপি মহোদয়কে কলেজ ম্যাগাজিন **'ম্যাগাজিন'** উপহার প্রদান

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ প্রভাতফেরি

২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস-২০২৬-এ দামেরখণ্ড বধ্যভূমিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

শিক্ষক পরিষদের আয়োজনে সুন্দরবনের আন্ধারমানিক ভ্রমণ

নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপন

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬-এ বাগেরহাট জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক পুরস্কার গ্রহণ করেছেন ড.অসিত কুমার বসু

মহান বিজয় দিবস ২০২৫-এ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর সূচনাপর্ব

প্রথমবারের মতো কলেজের অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর উদ্বোধন

দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

১৬৪তম রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন

১২৬তম নজরুল জয়ন্তী পালন

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা

ইন-হাউজ আইসিটি প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষা সফর-২০২৫, গদখালী, ঝিকরগাছা, যশোর

রোভার স্কাউটের কার্যক্রম

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৬-এ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর পুরস্কার বিতরণ

জনাব সুকুমার বিশ্বাস এবং জনাব অনিল কৃষ্ণ বিশ্বাস-এর পিআরএল উপলক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬-এ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষ্যে কলেজে শিক্ষার্থীদের আল্পনা অঙ্কন

১লা বৈশাখ ১৪৩৩-এর বৈশাখী শোভাযাত্রা

শিক্ষার মনোন্নয়নে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় ও মোটিভেশন সভা

একাদশ শ্রেণির (২০২৫-২০২৬) শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ

মোংলা সরকারি কলেজ বার্ষিকী ম্যানগ্রোভ -এর ৩য় সংখ্যা প্রকাশে ইয়ুথ ফর সুন্দরবন নেটওয়ার্কের শুভেচ্ছা

প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্যে দিন দিন বিপন্ন হয়ে উঠছে সুন্দরবনের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য। খাল-নদী হয়ে বনাঞ্চলে প্রবেশ করা এই বর্জ্য শুধু প্রতিবেশ ব্যবস্থাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, বরং স্থানীয় মানুষের জীবন- জীবিকাকেও হুমকির মুখে ফেলছে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর ও বরগুনা সুন্দরবন সংলগ্ন এই ৫টি জেলার ১৭টি এলাকাজুড়ে তরুণদের এই নেটওয়ার্ক স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলছে একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন।

আপনিও যুক্ত হোন

এখনই সময় এগিয়ে আসার। আপনার ছোট একটি পদক্ষেপও বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

বন্ধ করি প্লাস্টিক দূষণ বাঁচাই সুন্দরবন

YOUTH 4 SUNDARBANS

More Information visit Out FB Group Page : https://www.facebook.com/groups/475084962307416

১লা বৈশাখে প্রীতি ফুটবল খেলার আয়োজন

একদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির প্রীতি ক্রিকেট খেলার আয়োজন